রানার চলেছে, রানার

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

বীরেন্দ্র দত্ত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় খণ্ড / প্রথম প্রকাশ

১৫ এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক

শ্রীশঙ্খনীল দাস

এস-পি পাবলিশিং

ঋষি বঙ্কিমনগর বারুইপুর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ

দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স

৩২ বিডন রো কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

লেখকের স্কেচ ও অলংকরণ

শ্রীনিতাই ঘোষ

শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

উপনদী শাখানদী, শীতের বেলা, বিষণ্ণ পরবাস,
নির্জন দর্পণ, সমুদ্রের শব্দ, সামনে যুদ্ধ

ছোটগল্প

অমিল পয়ার, পুরনো পট ধুসর ছায়া, জলবিন্দু, বনান্তরে,
খেলার ছলে, হিসেব নিকেশ, পাহাড়ে সমুদ্রে, সহজ
কঠিন, মধ্যদুপুর, যীশুর পুতুল, শান্তিপর্ব, আমি ও সে,
মায়াবী মঞ্চ, শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রবন্ধ

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র, ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, সাহিত্যে
অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা, বাংলা ছন্দের সেকাল একাল

কাব্যগ্রন্থ

জন্ম জন্মদিন

সূচীপত্র

কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

'রানার চলেছে, রানার' কবি সুকান্ত সম্পর্কে আদৌ কোন গবেষণামূলক আলোচনা নয়। আবার পরিকল্পিত তিনটি খণ্ড কবি সুকান্তর গতানুগতিক জীবনীও যেমন নয়, তেমনি নয় তার কাব্যের ও গদ্যের পণ্ডিতী বিশ্লেষণ। কবির কোন্ কোন্ বিশেষ মানসিকতায়, প্রতিক্রিয়ায় ও পরিবেশে, বা ঘটনা-ক্রিয়ায় এক-একটি বিশেষ কবিতার জন্ম, তারই সুকান্ত-জীবন-মিশ্রিত পরিচয় আছে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে, 'জীবন-মন' অংশে। উনিশ শ' সাতাত্তর সালে প্রথম যে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়, তাকেই প্রচুর ঘষা-মাজা করে, অনেক নতুন অংশ সংযোজিত করে বর্ধিত আকারে একেবারে নবরূপে প্রথম খণ্ডে রাখা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডের এভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটি বাতিল করা হল। দ্বিতীয় খণ্ড 'যৌবন স্বপ্ন' এবং তৃতীয় খণ্ড 'হৃদয় সংবাদ' একেবারেই নতুন লেখা, ইতিপূর্বে কোনভাবেই প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডের লক্ষ্য সুকান্তর কবিতা-গুলির এক আবেগ-নির্ভর অভিনব গদ্যে সমালোচনা নয়, আলোচনা। নিরন্তর চলমান কবিমানসের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখাই এর মৌল উদ্দেশ্য। তৃতীয় খণ্ডে আছে সুকান্তর সমস্ত গদ্য রচনা ও চিঠিপত্রের রচনাকাল ধরে কবির সুগভীর অন্তর্লোকের উন্মোচন।

বর্তমান তিনটি খণ্ড রচনা করতে বসে আমি প্রধানত সুকান্তর দুই ভাই শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের যথাক্রমে 'কবি সুকান্ত' এবং 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত' নামের গ্রন্থ দু'টি থেকে যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সুকান্তর ব্যক্তি জীবন ও কবিতা রচনা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থ দু'টিই একমাত্র প্রামাণ্য। সুকান্তর জীবনীর চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগে, তথাকথিত সুকান্ত-প্রীতির নামে কেউ কেউ মিথ্যাচারে, অসত্য ভাষণে ও স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেগুলি ভুল, অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। সেগুলি সম্পর্কে সুকান্ত-অনুজদের বিস্তৃত বিবৃতি না থাকলে যে কোন গবেষকই বিভ্রান্ত হবেন।

আমার বর্তমান তিনটি খণ্ড রচনায় বিশেষভাবে যাঁদের স্মৃতিচারণ তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশী কাজে লেগেছে, তাঁরা হলেন—দুই কবিভ্রাতা মনোজ ভট্টাচার্য ও রাখাল ভট্টাচার্য, সরলা বসু, অরুণাচল বসু, ১৯৯১ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-ধন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, অবন্তী সান্যাল, মোহিত আইচ্, বুদ্ধদেব বসু, পারুল বসু, কে. জি. বসু প্রমুখ। এ ছাড়া পুরনো 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত খবরের অংশ-বিশেষ আমার কাজে লেগেছে।

প্রথম অধ্যায়

সুকান্ত কবি কবিতা

সর্বকালিক মানুষের আকুল প্রশ্ন : জগত কি ?

ঈশোপনিষদ বলেছেন : যা অনন্ত অস্থির, কিন্তু যা এক অচল সত্তার নিরবধি চলমানতা, তা-ই জগৎ !

কৃত্যপুত্র কবন্ধী জিজ্ঞেস করলেন : প্রাণ কী ?

আচার্য পিপ্পলাদ বললেন : আদিত্য অর্থাৎ সূর্যই প্রাণ।

অশ্বলপুত্র কৌসল্য-র জিজ্ঞাসা : কোথা থেকে প্রাণের জন্ম ? মানব শরীরের সংগে তার কি সম্পর্ক ?

আচার্য পিপ্পলাদ বললেন : প্রাণের জন্ম আত্মায়। মানুষের দেহ যেমন ছায়ার আশ্রয়, প্রাণের আশ্রয় তেমনি আত্মা। মনের সংকল্পেই মানব শরীরে প্রাণের আগমন।

চলমান জগতে দেহ, মন, প্রাণ, আত্মার সমবায়ে যে জীবন তার গতিবেগ ভয়ংকর—অসীম সমুদ্রের মত, তার বিস্তার বিস্ময়কর—নিঃসীম আকাশের মত !

জীবন-স্বভাবের ভিত্তি কি ?

ঈশোপনিষদ বলেছেন : জীবনের লক্ষ্য প্রকৃত আনন্দ-উপভোগ। জীবন-স্বভাবের ভিত্তি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে যথাবিহিত সাংসারিক কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান। এমন কর্মে কোন বন্ধন নেই।

কিশোর-পুরুষ সুকান্তর কবিপ্রাণের যে স্বরূপ তা তার তীব্র গতি-সম্পন্ন জীবন-স্বভাবেই ! কবি-প্রাণ কবিপুরুষের আত্মায় স্থিত। কিন্তু তার যে মনের বাসনা, তা ছিল নিরন্তর কর্মে সম্পৃক্ত। কবি সুকান্ত এক সৎ আত্ম-আস্থাবান বৈরাগী কর্মীও।

মনের অক্লান্ত কর্মবাসনা আর প্রাণের পরিশীলিত শিল্প-আত্মার আশ্রয়—এই দুই মিলে যে সুকান্ত-জীবন—তা আজও চলমান, আজও বেগবান তার সীমাবদ্ধ সময়ের সৃষ্টির মাধ্যমে !

জীবনের আর এক নাম যৌবন—অনন্ত যৌবন।

যৌবনের মূলে আছে স্বপ্ন, আছে কল্পনা।

অফুরন্ত স্বপ্ন আর অনন্ত কল্পনা দিয়ে যে যৌবন জীবনকে করে গতিপ্রাণ, রক্তিম, করে শাশ্বত, সেই যৌবনকে আমৃত্যু আলিঙ্গন করেছিল কবি সুকান্ত।

কবি চিরকিশোর, কিন্তু এক অভূতপূর্ব অনন্ত-যৌবনের অধিকারী।

জীবন আর বিদ্রোহ যেন এক অমিত-শক্তি পুরুষপ্রাণের দুই প্রসারিত সবল বাহু। যৌবন-প্রাণ তার সবল দেহ। যেনবা দেহ-আত্মার মিলিত এক অপরূপ রূপ!

সুকান্তর বলিষ্ঠ যৌবন এক কবির আর্তজীবন, এক অসমাপ্ত কবির সমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা!

কবির বিদ্রোহ এক বজ্রসার কবিপুরুষের যৌবন স্বপ্ন।

এ যৌবন-স্বপ্ন অনন্ত, অসীম, অপার বিস্ময়ে চকিত।

সুকান্তর কবিতা তার জীবনের রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ, তার যৌবন-স্বপ্নের শরীরী রূপ!

সশরীরে মানুষ সুকান্ত আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু কি বিপুল বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তার কবিতায়। সমস্ত কবিতায় সুকান্তর সেই ফটোর নেগেটিভ যেন উজ্জ্বলতম পজিটিভ।

এক একটি কবিতা বুঝিবা সেই ছুটে-চলা রানারের এক একটি পদক্ষেপ! তার হাতের লাঠিতে বাঁধা ঝুমঝুম ঘণ্টার এক একটি ধ্বনি-তরঙ্গ—'অগ্রগতির মেলে' 'নতুন খবরের' সংকেত-ধ্বনি! বুঝিবা এক একটি নতুন 'শপথের চিঠি'!

সুকান্তর কবিতা যেনবা সুকান্তর প্রিয়া—যাকে কোনদিন পরিপূর্ণ করে পায়নি কবি।

সমস্ত অতৃপ্তিকে জীইয়ে রেখে যে প্রিয়া দয়িতকে দূরে সরিয়ে রাখে অনন্তকাল—সুকান্তর কবিতা বুঝি সেই চির অতৃপ্তির যক্ষপ্রিয়া।

সুকান্তর কবিতা পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়—

> অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
> ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

সুকান্তর কবিতা যদি তার প্রিয়া হয়, তবে সে প্রিয়া আজ সকলের কাম্য প্রিয়তমার মতই বাঞ্ছিত বস্তু! সুকান্তর কবিতা আজ সর্বকালের সর্বমানুষের। তার কবিতা অতৃপ্তি জাগায় স্বভাবী পাঠকদের, বেদনা আনে মরমী সুকান্ত-প্রেমিকদের কবির অকাল-মৃত্যুর স্মরণে! লজ্জায় অধোমুখ হই বাংলাদেশের পাঠকদের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেকেই!

'সুকান্তর কবিতা সুকান্তকে ছাড়া আর কারুকেই মানাবে না।'

খাঁটি সত্য কথা। সমস্ত কবিতায় যে দুর্বাশার মত স্বাতন্ত্র্য, সুকান্তর দৃপ্ত, দীপ্ত ছায়া—জীবন্ত, আর্ত, আকুল-প্রাণ, সোচ্চার-কণ্ঠ!

'একথাও ঠিক নয়, কাউকে খুশি করার জন্যে সুকান্ত লিখেছিল। তাগিদটা বাইরে থেকে আসেনি। এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সংগে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।'

সুকান্ত নিজেই নিজের যৌবন, নিজের স্বপ্ন।

তার কবিতা তার জীবন, তার যৌবন, তার স্বপ্ন।

তার কবিতা যেন এক ক্ষণজন্মা কবির তিনরূপের সমাহার—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু! জন্ম তার জীবন, বিবাহ তার যৌবন, মৃত্যু তার স্বপ্ন।

কবি হয়েই সুকান্তর জন্ম!

কবিতার সংগেই তার বিবাহ!

কবিতার কারণেই তার মৃত্যু! মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন!

জন্ম মুহূর্তেই তার ললাট লিখন ছিল কবিতার কাছে প্রতিশ্রুত সমর্পণ।

যৌবনে ছিল অসম্ভব কবিতা-প্রেম, অনন্ত সেই নিখাদ প্রেমিকাকে অন্বেষণের মত। মৃত্যু তার নিয়তি নয়, কবিতার অন্তঃশীল স্বপ্নেরই আর এক রূপ রূপান্তর। শুধু কবিতার জন্যই শহীদ হওয়া!

'সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়ে নি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল।'

ভুল কথা, সুকান্ত রাজনীতির শহীদ!

একমাত্র সত্য—সুকান্ত কবিতার শহীদ।

কবিতার জন্য এমন শহীদ বাংলাদেশে সম্ভবত সুকান্তই প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত প্রত্যক্ষত সুকান্তই শেষতম দৃষ্টান্ত ! পরোক্ষে কবি-প্রাণের বৈশিষ্ট্যে কবি জীবনানন্দ দাশ !

'নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা।' বলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

জীবন আর কবিতা এই দু'য়ের সম্পর্ক সমুদ্রের জল আর সমুদ্রের অগনন স্তনন ও তরঙ্গের সম্পর্কের মতো।

জীবন আর কবিতা—এ দু'য়ের মধ্যে আছে যৌবন আর স্বপ্ন। সমস্ত কবিতায় তারই প্রতিবিম্বন।

সুকান্ত জন্মেছিল কপালে কালের রক্তিম তিলক নিয়েই। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সে তিলক। তফাৎ শুধু—কর্ণ কবচকুণ্ডল দান করে হৃত ও হতপৌরুষ হয়েছিল, সুকান্ত জীবনকে কালের হাতে শহীদ করে সেই তিলককে শিল্পরূপে দীপ্ত করে গেছে তার কাব্যে।

কাল তার এক হাত ধরে তার লেখনী চালনা করে। কাল তার অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের মত চালক—নিপুণ, দক্ষ, অমোঘ, ন্যায়ে-সত্যে দীপিত।

আর এক হাত ধরেছে মহাকাল। মহাকাল সুকান্তর রক্ত-মাংসের জীবন নিয়েছে, কিন্তু কবিতায় দিয়েছে ভয়ংকর গতি। সুকান্তর কবিতায় আবহমানকালের গতিই সত্য, গতিই জীবন, গতিই স্বপ্ন।

কবিতার চালিকা শক্তি 'কাল' বহুবর্ণে রঞ্জিত করেছে সুকান্তর কবিতাকে। সামান্য কয়েক বছরে এক কিশোর কবিকে অঢেল কাব্য-বিষয় উপহার দিয়েছে তার কাল !

উনিশ শ একত্রিশ সাল।

এ সময়ে জীবনী গ্রন্থ লিখে অসাধারণ খ্যাতি পেয়েছেন জার্মান লেখক এমিল লুড্‌ভিগ।

যোশেফ স্তালিন তাঁকে, মার্কস্-এর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, বললেন, লেনিনের ব্যাখ্যার মূল কথা হল—সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জনগণই ইতিহাস সৃষ্টির মূলে।

এমন জনগণের সামগ্রিক উত্তাল রূপ দেখা দেয় উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের মধ্যে।

একপ্রান্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, আর এক প্রান্তে ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জন। এর মধ্যবর্তীকালে যে জনস্রোতের—গ্রাম বাংলা ও শহর কলকাতা—উভয়তই, পরিচয়, তা এলোমেলো উত্তাল ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে-থাকা দামাল বৃক্ষের মত।

সামনে যত বাধা, মাটির গভীরে ততই নতুন নতুন প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস।

জনগণের এই শিক্ষা সুকান্তর সমস্ত কবিতার শিক্ষা।

জনগণের এই রূপ সুকান্তর কবিতার বিষয়।

সুকান্তর সামনে অগণন মানুষ, সুকান্তর ভিতরে উজ্জ্বল আলোয় দীপ্ত শিল্পচেতনা।

এক কিশোর কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সংগে গভীর জ্বালায় আর স্তম্ভিত হৃদয়ে চীৎকার করে ওঠে কবিতায়।

চীৎকার হল প্রতিবাদ, হল বিপ্লব, হল বিদ্রোহ।

চীৎকারে আছে রাজনীতি, আছে শ্লোগান, আছে এক নিরলস কমিউনিষ্ট কর্মীর জীবনপণের সর্বত্যাগী শপথ।

কিন্তু সব সংযত হয়েছে সত্যিকারের এক কবির শিল্পবোধের যথাযথতায়।

দু'চোখের সামনে, মনের মধ্যে তা হয় অসম্ভব চীৎকার।

রাতের বিশ্রামে সেই মনের আধার থেকে যখন প্রাণে আসে, কবি-আত্মার অধিগত হয়, যখন এক অলৌকিক শান্তি—যা ঋষিদের মধ্যে দেখা দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্য—সেই শান্তির মধ্যে সুকান্তর লেখনী-ত্বরিত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

মানুষ সুকান্ত, কবি সুকান্ত তাকে জানে না, চেনে না।

সে নিয়তির মত আর এক সুকান্তকে নিঃশব্দে গড়ে দিয়ে যায়। এই তৃতীয় সুকান্তর কঠিন ছায়া তার সমস্ত কবিতায়। এখানে সে

কমিউনিস্ট হয়েও কমিউনিস্ট নয়, কর্মী হয়েও কর্মী নয়, কবি হয়েও কবি নয়। সে মহাকালের হাত-ধরা এক দৃপ্ত কিশোর পুরুষ!

তৃতীয় সুকান্তের অনুসন্ধান তার কবিতাতেই সম্ভব। কালের হাতে তার সৃজন, লালন-পালন এবং কালের কর্তব্য শেষে মহাকালের সংগে তার যাত্রা।

সুকান্তর রচনার কাল রামধনু-রঞ্জিত আকাশের মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর এরই অমোঘ 'বাই-প্রোডাক্ট'—ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, প্রত্যক্ষ রাজনীতির বিপুল বিস্তার, বিপ্লব-বিদ্রোহ-গণবিক্ষোভ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই সমস্তই হল সুকান্তের কাব্যের বিষয়। বিশেষ কাল এই সব বিষয়ের নিপুণ সংগ্রাহক!

সচেতনভাবে সমাজ-পরিবর্তন ছিল এসবের মধ্যে বার বার ধ্বনিত-হওয়া একটি বাঁশির সুরের মত।

সমস্ত কিছুর বদল চাই। দিন বদলের পালা—

> দ্বিগ্বিজয়ী দুঃশাসন!
> বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন
> তুমি আছ দৃঢ় সিংহাসনে সমাসীন,
> হাতে হিসেবের খাতা
> উন্মুখর এ পৃথিবী :
> আজ তার শোধ কর ঋণ।

কালের মাটি দিয়ে গড়া অজস্র পুতুল হল সুকান্তর সমস্ত কবিতা।

মাটির পুতুল রাঙা রূপ পেয়েছে শিল্পের মায়ায়। এ মাটির পুতুল আর একটিও ভঙ্গুর নয়।

সুকান্তর কবিতার বিষয় তার বেঁচে থাকার, প্রতিদিনের বিপুল কাজের মধ্যে থেকেই তৈরী হয়ে যায় কখনো-কখনো।

কাল তার মঞ্চ, কর্ম তার অভিনয়, কবিতা তার অভিব্যক্তিনিপুণ দরদী অসম্ভব ক্ষমতাবান এক অভিনেতার শিল্পীত অভিব্যক্তি!

যার কাব্য বিষয় তার কর্ম থেকে জাত, তার বিষয়ে শুধু বিশেষ কালের স্রোতই ছবি হয় না, কবির মনের ভাল-লাগাগুলিও মনোরম চিত্র হয়ে ওঠে।

তাই কাব্যের বিষয় আরও ব্যাপ্ত হয়ে যায় ছোটদের ছড়া রচনায়, অসম্ভব হৃদয়ের সমস্ত রক্ত উজাড় করে দেওয়া দরদী গান রচনায়, কিছু কাব্যনাট্য বা গীতিনাট্য লেখার প্রয়াসের মধ্যেও। 'অভিযান', 'সূর্যপ্রণাম'—এই প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত।

সুকান্তর কবিতার বিষয় এক সুবিশাল অন্ধকার মঞ্চের ওপর অজস্র বিচিত্র বর্ণের নতুন আলোর মত আকর্ষণ করে পাঠককে, মুগ্ধ, বিস্মিত, কখনো বা স্তম্ভিত করে দর্শক আসনে উপবিষ্ট অগণন নীরব নিথর দর্শকদের মত।

সুকান্তর কবিতার এক একটি বিষয় এক একটি আলোর চুম্বকের মত। কেবলই মঞ্চের অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে মঞ্চটি আলোয় প্লাবিত করে দেয়। সেক্ষেত্রে পাঠকদের উল্লাস মুক্তির উল্লাস, সমবেত শপথের উল্লাস, বলিষ্ঠ বিপ্লবের বিশ্বাসে রূপ নেয়।

সুকান্তর কবিতার সমস্ত বিষয়-বৈচিত্র্যের মূল তার কাল, তার সময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল ও সুকান্তর কবিতা

'শিল্প সাহিত্যের যে কোন একজন স্রষ্টার পক্ষে তার রচনার নির্বিশেষ কাল—এক অর্থে মহাকাল তার নিয়তি, কিন্তু বিশেষ কাল তার নিয়ন্ত্রক।

নৌকার হাল যে ধরে রাখে, নৌকার দাঁড়ি তারই নির্দেশে দাঁড় বয়ে যায়। হালের নির্দেশ না মানলে দাঁড় বওয়া অসার্থক, নৌকা অচল।

তা সত্বেও তার যেটুকু চলা, তা শুধু লক্ষ্যহীন ভেসে যাওয়া! বিলাসের ভ্রমণ!

সাহিত্য নিশ্চয়ই নিছক বিলাস নয়।

স্রষ্টার পক্ষে বিশেষ কাল সেই নৌকার হাল ধরে বসে থাকা মানুষটি, স্রষ্টা স্বয়ং সেই দাঁড়ি।'

কাল নিজেকে ক্রমশ দিতে দিতেই অলক্ষ্যে মহাকাল রচনা করে যায়। কিন্তু মহাকালকে সে নিজে চেনে না। চিনিয়ে দেয় কালের বিশেষ কবি, শিল্পী।

কবির কাব্যে কাল রূপ নেয়। কবি স্বয়ং কবিতার মধ্যে কালকে সম্পূর্ণ অভিনন্দিত করে কালের মর্যাদা, সেই সংগে কবির কবিতার মর্যাদা—দুইকেই সম্মান দেন।

সম্মান দিয়েছিল সর্বাংশে সুকান্তও।

ত্বকের সংগে যেমন মাংস, মজ্জা, হৃৎপিণ্ডের যোগ থেকে যায় সূক্ষ্ম রক্তনালীর মধ্য দিয়ে, তেমনি সুকান্তর কবিতার কাল ছিল তার ত্বক এবং কবিতার ছন্দ, শব্দ, ছবি, বিষয়—সমস্ত দিয়ে তার গভীর সম্পর্ক আছে কালের সংগে।

কবিতায় সুকান্ত দক্ষ দাঁড়ি, দাঁড় টানায় তার ভুল নেই।

অথবা—এভাবে বলা ভাল, সুকান্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মাধ্যাকর্ষণ মেনে চলার মত কালের শিকার। তার কাল তাকে পৃথিবীতে এনেছে, আবার কালই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

কালের নির্দেশ অমান্য করার স্পর্ধা সুকান্তর ছিল না।

অথবা—সুকান্ত সবসময়েই কালকে পিছনে রেখে, অস্বীকার করে সহজ, সরল রোমান্টিক গুণগুণ গান শোনানোর স্পৃহায় ছিল আগাগোড়া বীতশ্রদ্ধ।

হয়ত, দুই দিকই এক কেন্দ্রে কঠিন প্রত্যয়ে স্থিত ছিল বলেই সুকান্তর সমস্ত কবিতার কাল হয়েছে ধ্রুবতারা, কাল হয়েছে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, জল, স্থল, অন্তরীক্ষের মত সত্য, শাশ্বত অবধারিত!

'যে গাছ শাখা-প্রশাখা পাতা-ফুল-ফলে-বিস্তৃত হ'তে হ'তে ওপরের দিকে বড় হয় না, শুধু একটানা বেড়ে যায়, সে শুধু ঊর্ধ্বের আকাশ-টুকুই দেখে, চেনে। চারপাশের আলো বাতাস ও মাটির ছায়ার শীতলতার আকর্ষণে সে অনেক কিছুকে আপন করতে পারে না, জানেও না!

তবে সম্পূর্ণতা কিন্তু এসব নিয়েই!'

সুকান্ত কবিতার বিষয়ে কালকে গ্রহণ করে একজন সম্পূর্ণ পুরুষ।

এক কিশোর কবি হয়েছে পুরুষ-কবি—পৌরুষ-দীপ্তি তার কবিতার সর্বাঙ্গে!

যে কোন কবির কাব্যে তার কালচেতনা তার ইতিহাস-চেতনার নামান্তর। 'জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা।' এ হ'ল স্তালিনের ব্যাখ্যা লেনিনের। কবিরা ইতিহাসের টীকাকার।

সুকান্তর কবিতায় কাল এসেছে নদীর জলের মত স্বাভাবিক অনায়াস প্রবহমানতায়।

নদী নিরবধি, কাল নিরবধি। নদীর অভিমুখ ও শান্তি সমুদ্রে কালের যন্ত্রণার অবসান মহাকালে।

সুকান্তর কবিতায় কালচেতনা আরও বড় কালকে প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সেই বড় কাল বিশেষ কোন কাল নয়, মানুষের মানবিকতা

দিয়ে গড়া বড় বলিষ্ঠ আত্মবিম্ব। এই কালকে মহাকাল ধ্বংস করে না, লালন করে, নিন্দিত করে না, অভিনন্দিত করে। এমন বড় কালের জন্যই তো মহাকাল। এমন বড় কালের জন্যই তো মানুষের অবিরাম সংগ্রামের উল্লাস!

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের কালে বসে এক কিশোরের এই যে অকপট অকৃত্রিম, প্রত্যয়ঋদ্ধ কাব্যময় স্বীকৃতি—এ তো কবির কালচেতনার অত্যদ্ভুত এক প্রমাণ!

প্রতীক-প্রতিম ব্যঞ্জনায় সুকান্ত যখন 'দেশলাই কাঠি' কবিতার শুরু এভাবে করে—

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগন্য, হয়তো চোখেও পড়ি না :
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস ;
আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

অথবা, যখন সমকালের প্রেক্ষিতে চেতনায় দীপ্ত হয়ে ওঠে কবি-স্বরূপ 'আগ্নেয়গিরি'র ভাষায়—

কখনো হঠাৎ মনে হয় :
আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।

তখন কালের কণ্ঠে সময়ের গভীর ছায়ার স্পর্শ আমরা হৃদয়ের শব্দের সংগে মিশে যেতে দেখি!

স্মরণে আসে সুকান্তর জীবৎকাল!

জন্ম উনিশ শ' ছাব্বিশ, মৃত্যু উনিশ শ' সাতচল্লিশ।

সুকান্তর কালকে যদি বলি এক দীর্ঘাকার দণ্ডায়মান পুরুষ—যার মাপ একুশ নামক একটি সংখ্যার মধ্যে ধরা!

উনিশ শ' উনচল্লিশে যুদ্ধ শুরু। সুকান্তর বয়স কৈশোরে পা-রাখা, কবিতায় সেই দীর্ঘাকার পুরুষের ছায়াপতন স্পষ্টত শুরু!

কবি সচেতন না হলে কবিতায় 'কাল' সচেতনায় সুন্দর হয় না।

সুকান্তর বয়স সচেতন হওয়ার বয়স—যদিও কিশোর, তবু কিশোর মনেই—এই উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল থেকেই।

কালের প্রতিবিম্ব খুব দ্রুত কিশোর কবির চেতনা স্পষ্ট করে। কিশোরকে করে যৌবনদীপ্ত পুরুষ। সুকান্ত কঠিন পৌরুষ দিয়েই কালকে কবিতায় নন্দিত করে নেয়।

সুকান্তর অচেতন-চেতন স্বভাবে স্থিত একুশ বছরের কালটির স্বভাব কি রকম?

এ জিজ্ঞেসা সমস্ত সহৃদয় পাঠকের!

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু ও জরা-রূপ তখন।

একদিকে তার প্রবল দোর্দণ্ড প্রতাপের চেহারা, আর তারই ভিতরে তার নিজেরই নিজের গলা টিপে মারার বাসনা, সংকেত, হয়ত বা দম্ভও।

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র সেই জটিল জালে ঘেরা ভয়াল অন্ধকারে বাস-করা রাজার মত!

এমন আত্মধ্বংসী রূপাবয়বের কারণ—আর এক বিশ্বে সমাজতন্ত্রের রথের একাধিক চাকার সবল ধ্বনি ও নির্বাধ অগ্রগমন।

এ সময় সাম্রাজ্যবাদের 'সোয়ান সঙ'! বিকৃত পুঁজিবাদের কাকের কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার। আর বিশ্বজনীন সমাজতন্ত্রের আসন্ন অভ্যুদয়ের অপেক্ষায় বিশ্বের আকাশ উষালগ্নের রক্তিমতায় বিস্ময়মুগ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ ও বিস্তার, কৌশল ও অবসান—সমস্ত কিছুর মধ্যে ছিল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, পুঁজিবাদের উৎখাত ও সমাজ-বাদের লালন।

রাম-রাবণের যুদ্ধের মত। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদ হল সেই রাবণ, সমাজতন্ত্র সেই রামচন্দ্র।

সুকান্তর কবিতা এমন বিশেষ পরিবর্তন-মুখ কালের নামাবলী

জড়ানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তথা তারই সৃষ্টি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত জাগ্রত জনমানসের বলিষ্ঠ বিপ্লবের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়াস।

সুকান্তর কবিতা এমন এক উতরোল সময়ের নির্ভরযোগ্য দলিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের দাপট ছিল প্রবহমান ঘূর্ণিঝড়ের মত। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, বর্বর তার রূপ।

সাম্রাজ্যবাদ তখন রাশিয়াতেও।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র, দুর্বলচিত্ত, ধর্মভীরু দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রাশিয়ার জার অর্থাৎ সম্রাট। তার রাজত্বকালের সময়-পরিধি আঠারো শ' চুরানব্বই থেকে উনিশ শ সতেরোর মধ্যবর্তীকাল। রানী, ইংলণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক নাতনী আলেকজান্দ্রাও স্বামীর অনুরূপ দুর্বল, ধর্মভীরু। কিন্তু দুজনেই সম্রাটের একচ্ছত্র অধিকারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তুলনায় স্ত্রী আলেকজান্দ্রা অনেক বেশী সম্রাটের ক্ষমতা, লাভ ও লোভ সম্পর্কে সচেতন।

তার ওপর রাস্‌পুটিন নামে এক গ্রাম্য লম্পট, সুরাসক্ত সন্ন্যাসীর অসামান্য যাদুশক্তির ওপর বিশ্বাসে তারা, জার-দম্পতি সদা চালিত।

রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ যখন এদের নির্ভরতায় তুঙ্গে, তখনি সেই ভয়ংকর শব্দে শিকল ছিন্ন করার সংবাদ আসে রাশিয়া থেকে।

উনিশ শ' সতেরো সালের সাতই নভেম্বর।

নেতা লেনিন। সঙ্গী সমস্ত শ্রমিক আর অন্যান্য চিরকালের বঞ্চিতশ্রেণীর মানুষ। আঘাত হানে জারের শাসনের মূলে। সাম্রাজ্যবাদ কেঁপে ওঠে। সমাজবদলের আসে ডাক। ইতিহাস আবার চলতে শুরু করে দিক বদল করে!

এই চলার, ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সারথি ছিল সেই সময়ের নবোদ্ভূত সমাজতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদী মানুষের পোষ্য পুঁজিবাদ।

মানবতাবাদী মানুষের জঠর থেকে জাত পুত্র সমাজবাদ।

সুকান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই পুঁজিবাদ আর সমাজবাদের সংঘর্ষের ক্রান্তিরেখায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে কবিতায় নির্দেশ দিয়ে গেছে কালের নতুন কথার, নতুন জীবন গড়ার, নতুন প্রত্যয় ও বিশ্বাসের, নতুন বিপ্লবের।

সুকান্তর বিশ্বাস সুকান্তর কর্ম, সুকান্তর শপথ সুকান্তর জীবন, সুকান্তর কবিতা সুকান্তর রক্ত।

নেমে আসে সুকান্ত সংগঠনের মধ্যে কর্মের আহ্বানে, সাম্যবাদে দীক্ষা ঘটে ক্রমশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন সুকান্ত কবিতায় তাই কালকে কর্মে-ঘর্মে-মর্মে ওতপ্রোত করেছে।

বিখ্যাত 'লেনিন' কবিতাটি প্রথমেই মনে পড়ে। মনে পড়ে 'চারাগাছ', 'চিল', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'-র মত উচ্চ শিল্পরসসিক্ত কবিতা —যাদের বিষয়ে আছে সমকাল, প্রকাশভঙ্গিতে আছে কালের দীপ্ত, বাধাহীন আবেগ-তরঙ্গ। 'মণিপুর', 'মুক্তবীরদের প্রতি', 'ইউরোপের উদ্দেশে', 'মহাত্মাজীর প্রতি', 'মার্শাল তিতোর প্রতি', কবিতায় স্বদেশভাবনা ও বিশ্বভাবনা সমান আবেগে বেগবান।

সুকান্ত তার স্ব-কাল যা—সমগ্র বিশ্বের কালপটে চিহ্নিতও—সম্বন্ধে কি ভয়ংকর সচেতন ছিল, তার এ জাতীয় সমস্ত সচেতনা কতটা স্পর্শকাতর ছিল, সেই সংগে ইতিহাসের সত্যতায় বিশ্বাস, প্রামাণিকতায় নিষ্ঠা—এ সবের দলিল হল বিশেষ সাল-তারিখ-চিহ্নিত কবিতাগুলি— চট্টগ্রাম: ১৯৪৩, মধ্যবিত্ত '৪২, সেপ্টেম্বর '৪৬, ১লা মে-র কবিতা '৪৬, একুশে নভেম্বর: ১৯৪৬, ১৯৪১ সাল, রোম: ১৯৪৩।

সুকান্তর জন্মের আগে যে লেনিন রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের মূলে সমবেত শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ প্রয়াসে বজ্রের আঘাত হানে, 'লেনিন' কবিতার প্রথমেই তাঁর স্মরণ—

> লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
> অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।

কবিতার শুরু বিশেষ লেনিনকে মনে রেখে, কিন্তু তার বিস্তার

বিশ্বস্মরণে। ভারতের বুকে কবির লেনিন-স্মরণ সুদূর রাশিয়ার অনুপ্রেরণার সূত্রেই—

আজকেও রাশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

'লেনিন' কবিতার রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশের আতঙ্কগ্রস্ত শহর কলকাতার পরিবেশে। 'আজকেও' এমন একটি চলিত, কথ্য শব্দের প্রয়োগে স্ব-কালের প্রভাবকে অস্বীকার করি কি করে?

কবিতাটিতে কাল চেতনা কি শুধু লেনিন নামটি স্মরণেই? না, এমন সীমিত ভাবনায় 'লেনিন' নামের দুর্ধর্ষ কবিতাটি শুরু, বিস্তার ও সমাপ্তি রচিত হয়নি।

'লেনিন' কবিতার প্রথমে যেন একটি গুরু গম্ভীর ধ্রুপদী ঘরানার গানের আলাপ, মধ্যে বিস্তার, সর্বাঙ্গে 'সম'-হীন আবেগ।

বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

কবিতা লিখতে বসে বিশেষ দিনের ঘটনা, সংবাদ সুকান্তকে, কবি-মনটিকে বিশেষ তৎপর রাখে।

কবিতার শেষে কবি ভারতের দুর্দিনের অন্ধকারে এসে কিছুটা স্থিতপ্রজ্ঞ। কালচেতনা তার প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও চিন্তিত করে তোলে। কারণ—

বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি; পরস্পর অযথা সন্দেহ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্যত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভৎ'সনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—

দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু, যুদ্ধ-ভাবনা, রাজনীতি, সাম্যবাদ, বিদ্রোহ-বিপ্লব—এসবের 'ক্রস্‌কারেন্ট' তখন কলকাতা তথা সারা বাংলায় এবং উত্তাল ভারতবর্ষেও। কবির কপোলের গভীর বলিরেখা চিহ্নিত ভাবনার

মধ্যেও কিন্তু মনন কবি-আত্মার আবেগে চকিত হয়ে ওঠে। কবিকণ্ঠে পরমুহূর্তেই ধ্বনিত হয়—

'এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন!'

লেনিন স্মরণে যে কবির কাল চেতনা, 'চারাগাছ' কবিতায় সূক্ষ্ম প্রতীকের দ্যোতনায় সেই কাল-স্বভাবের ছায়ায় বিম্বন! 'চারাগাছ' কুঁড়েঘরের কবির চোখে পড়ে হঠাৎই—

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি—
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

অতি প্রাচীন অট্টালিকার কার্নিশে এক তরুণ অশ্বত্থ শিশু! তাকে দেখা মাত্র—

'আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল এক পলকে।'

কবির কালচেতনা আগামী অনেক কালের সূত্রের সংগে গ্রথিত হয়ে যায়।

কিন্তু 'চারাগাছ'-এ একটি তরুণ অশ্বত্থ শিশুকে দেখে কবির কোন্ কালচেতনার প্রকাশ?

একটি জীর্ণ অট্টালিকার ইতিহাস অগণন মানুষের অশ্রু, ঘাম, রক্তের অক্ষরেই নিঃশব্দে লেখা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ, সমকাল ও পরবর্তী কালের অগণন নিছক দ্রষ্টা-মানুষ সেই অট্টালিকার সেই গোপন দলিল দেখে না, ভাবে না। জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হবার সময়ও তারা সেই বনিয়াদি প্রাসাদের অন্ধকার অন্তঃপুরের গভীর শ্বাসের ধ্বনি কানে নেয় না—'তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়্!'

সুকান্ত 'চারাগাছ'-কে কেন্দ্র করে—সেই বৃহত্তম বৃক্ষ যার শিকড় লক্ষ লক্ষ মুখ দিয়ে বিদীর্ণ করতে করতে তাকে ধ্বংস করে—প্রতিবাদ জানায়।

প্রাসাদ তো কবির চোখে শোষণের জ্বালার অতি দীর্ঘ ইতিহাসের দম্ভ ও অহংকারের প্রতীক। যুদ্ধ-সমকালে কবির এমন কথা মনে পড়ে। কারণ, ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাস তখন একদিকে বৃটিশ প্রবর্তিত নব সামন্ততন্ত্র, তার অহংকার, আভিজাত্য আর একদিকে সারা বিশ্ব জুড়ে

জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও নতুন সমাজতন্ত্র-অভিমুখী জয় যাত্রায় উতরোল। পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে যে বিবর্তনকাল —তার এক সন্ধিলগ্নের কাব্যিক স্বীকৃতি হল 'চারাগাছ'।

চারাগাছ কবি সুকান্তর স্ব-কাল ও বিশ্ব-কালের আকাশপটে ইতিহাসের রক্তাক্ত স্বাক্ষরে বেড়ে-ওঠা নতুন এক তরুণ দলের প্রতিনিধি —যে নিজে নির্বিত্ত শ্রমিক, আবার কৃষক, আবার প্রজা, আবার অবহেলিত সমস্ত রকম চক্রান্তের শিকার মধ্যবিত্তও!

'চারাগাছে'র কথায় মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' রচনার অনুপ্রেরণার কথা। পাথরের বুকেও একদা সবুজ শিশু গাছের জন্ম দেখেছিলেন বিশ্বকবি। সেই প্রাণশক্তির আর 'চারাগাছে'র প্রাণশক্তির প্রকাশ যে কাব্যাধারে, দুয়ের মধ্যে কতো যোজন দূরের পার্থক্য!

রবীন্দ্রনাথ গেছেন উত্তুঙ্গ কল্পনার নন্দন তত্ত্বে—যা কবির আত্মানুগত বোধ ও বুদ্ধির প্রকাশ! কবি সুকান্তর সেক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবের স্বীকৃতিতেই মর্যাদা! অপরজন কালকে আলিঙ্গন করে তত্ত্ব নয়, বাস্তব জীবনের নিরন্তর, মুক্ত, বিশুদ্ধ অগ্রগামিতায় সামিল। দ্বিতীয়জনও একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কবিতার বাস্তবতার প্রয়োগে সুকান্ত সম্পূর্ণ নতুন ধারার পথিকৃৎ!

সুকান্ত বাংলা কাব্যধারায় যে ঘরানার কবি, প্রতিষ্ঠিত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই ঘরানায় আজও কাব্যচর্চায় রত। তিনি সুকান্তর একদা সহকর্মী এবং কবিতার স্বভাবী ও সহমর্মী পাঠকও।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'। সুকান্তর মৃত্যুর অনেক পরে লেখা।

এই কবিতায় কবি প্রতীক নিয়েছেন কচি কচি পাতায় সবুজ গাছ :

> শান বাঁধানো ফুটপাথে
> পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
> কচি-কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
> হাসছে।

এ কবিতাতেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্ব-কাল চেতনায় স্থিত-প্রতিজ্ঞ। 'দড়ি পাকানো সেই গাছ' প্রাণধর্মী মানুষের সংগ্রামী সত্তার প্রতিভূ। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের অস্তিত্বরক্ষার ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রতীক। বসন্তের প্রাণোচ্ছ্বাসে আপন বিজয়বার্তা ঘোষণা আছে কচি-কচি পাতার হাসির রেখায়। একালের নাগরিক গলির জীবনের গ্লানি আর ক্লান্তির প্রেক্ষাপটে কবি রেখেছেন কচি কচি পাতা ধরা গাছের বিপরীত স্বভাব।

সুকান্তর 'চারাগাছে' এই প্রতীকের ব্যবহারে পুরনো অট্টালিকার প্রেক্ষিতে শোষিত জনগণের ব্যাখ্যা! একই ঘরানার দুই কবির শব্দ ও শব্দচিত্রে ব্যঞ্জনাদানে কি আপাত বিপরীত মানসিকতা! আসলে দুই কবিই গভীরতম অর্থে একই ব্যঞ্জনার আকর্ষণে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রবল জীবন-আকর্ষণের সুষমায় ও শক্তিতে বিশ্বস্ত!

প্রতীক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কালকে চিহ্নিত করার প্রয়াস আছে সুকান্তর একাধিক কবিতায়। সম্ভবত তির্যক বাকভঙ্গি কবিতায় বাস্তবতার স্বীকৃতিকে গভীর-প্রোথিত করার পক্ষে তা-ই বুঝি একমাত্র উপায়।

'চিল' কবিতা আর এক প্রমাণ। মুসোলিনীর পতনে লেখা এই কবিতা।

ফুটপাতে মরা চিল দেখে কবির কাব্যময় অভিব্যক্তি—

> চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
> অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
> লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ;
> যার শ্যেনদৃষ্টিতে কেবল ছিল
> তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
> তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।

কবিতাটি লেখার অব্যবহিত পূর্বে ও সমকালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবলতম যুদ্ধ চলেছে সারা পৃথিবীতে। মুসোলিনী সেই ফ্যাসিবাদের এক বিশাল স্তম্ভ সেকালে। এমন মানুষের পতন বাংলাদেশের এক

কিশোর কবির মনে এনেছে জ্বালা, সেই সংগে মুক্তির আরামপ্রদ শ্বাস।

কালের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা কবির অনুভূতির ইতিহাসে এক অসাধারণ কবিতার স্বাক্ষর রেখে দেয় 'চিল'!

নতুন এক ইতিহাস, এক কালের ইঙ্গিত এ কবিতায় প্রতীকের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় অপরূপ—

> তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে;
> নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
> আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে॥

সুকান্তর কবিতায় কাল চেতনা, বিশ্বচেতনার নির্যাস। কালচেতনা অগ্রগামী বিশ্বচেতনার তথা সমাজ-চেতনার স্পষ্ট, বিশুদ্ধ, সত্য শপথ ও অঙ্গীকার!

> একদা দুর্ভিক্ষ এল
> ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
> পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
> ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
> একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস। (ঐতিহাসিক)

> কলকাতায় শান্তি নেই।
> রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
> প্রতিটি সন্ধ্যায়। (সেপ্টেম্বর '৪৬)

> এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
> আবার বোমারু রক্ত পান করে,
> ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
> শাণিত দ্বৈত নগ্ন অন্যায়ে; (মধ্যবিত্ত '৪২)

> এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে

যদিও কুয়াশা ঢাকা আকাশের নীল,
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েত পাশে॥ (রোম : ১৯৪৩)

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রুতার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা ? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে ? (মণিপুর)

উদ্দাম ধ্বনি মুখরিত পথে ঘাটে,
পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে
মুক্তির দাবি করেছি তীব্রতর,
সারা কলকাতা শ্লোগানেই থরো থরো।
এই সেই কলকাতা !
একদিন যার ভয়ে দুরু দুরু বৃটিশ নোয়াত মাথা।
মনে পড়ে চব্বিশে ?
সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে,
হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখের
পরিষদ গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে
গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই :
রক্তের বিনিময় হয় হোক, আমরা ওদের চাই।
(মুক্ত বীরদের প্রতি)

এই সমস্ত চিত্রে, শব্দে, বাক্যে ও সংবাদে যে সময় চিহ্নিত তা সুকান্তর সৃষ্টির সামনে ছিল চলমান। স্থানিক কাল বা সময়-মুহূর্ত সুকান্তর কবিতায় ছিল ডায়েরীর মত।

সুকান্তর কবিতা কবি সুকান্তর অন্তরঙ্গ ডায়েরী।

ডায়েরীতে থাকে নির্দিষ্ট কাল, নির্দিষ্ট কথা, নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট স্বীকৃতি। সে স্বীকৃতি কবির কালকে করে বিশেষ থেকে নির্বিশেষের, কথাকে করে কবি-আত্মার আয়নায় ধরা শরীরী রূপের অস্তিত্ব, আর, সমগ্র কবিতাকে করে বাস্তব সত্য সংবাদের ঊর্ধ্বে কবির অমোঘ লক্ষ্যের নিপুণ শাণিত অস্ত্র।

সুকান্ত যখন বলে—

'দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও
সান্ত্বপত্র মাড়াও, দুপায়ে মাড়াও।' (ডাক)

অথবা

'এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;' (প্রথম বার্ষিকী)

তখন কবির কালচেতনার সংগে সম্পৃক্ত থাকে কবির উদ্দেশ্য—সে উদ্দেশ্য কখনো রাজনৈতিক, কখনো সামাজিক, কখনো বা ঐতিহাসিক, আবার কখনো সম্পূর্ণত কাব্যিক। যেখানে কাব্যিক সেখানে সুকান্ত ব্যক্তি সুকান্তকে গোপনে রেখে কবি-আত্মাকে কৌশলে পাঠকের সামনে আনে।

সুকান্ত স্বয়ং একটি কাল। সুকান্তর কবিতা একটি বিশেষ কালের নির্বিশেষ অক্ষর-শব্দ-ব্যঞ্জনায় আঁকা দলিল। সুকান্তর প্রতিটি কবিতায় সেই সময়ের গভীর ছায়া।

সময় শুধু কলকাতা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষকে মিলিত করেই থেমে থাকেনি, স্তব্ধ হয়ে যায়নি, সময় প্রসারিত হয়েছে সারা পৃথিবী আবৃত করেই।

কলকাতা তথা বাংলাদেশ সেই তান্ত্রিকের আসনে রাখা শবদেহ, যে তন্ত্রের সমস্ত আচার অন্তে গভীর সাধনায় ধ্যানে ইহলোক-পরলোক, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বিচরণে সক্ষম।

শব্দ দেহ অর্থাৎ কলকাতা তথা বাংলাদেশ সেই কাল, সুকান্তর কবিতা রচনা সেই গভীর ধ্যান, সাধনা।

আর সাধনার মাধ্যমে, সাধনার শেষে আজকের স্বভাবী অগণন পাঠককুলের যে পাওনা তা যেন সৎ তান্ত্রিকের শরীরের নয়, পরিশীলিত আত্মার বিভূতি—মহাকালের দ্যুতিময় বিভা।

সুকান্তর কবিতায় কালের বিম্বন বড় অর্থে স্ব-কাল ও আগামীকালের মহাকালের নির্ভয় শপথ।

কবি সুকান্ত স্বয়ং কোন কালের স্রষ্টা নয়, কালের সৃষ্টি। কিন্তু

কালকে অতিক্রম করে সুকান্তর যে মুক্তপ্রাণের আবেগ-দীপ্ত ,অগ্রগমনের স্বাক্ষর থেকে গেছে কবিতায়, তা কবি-প্রতিভার ধর্ম, তাতেই সে নিজেই রানার।

'কালের কপোলতলে' অনন্তকাল ধরে একটি দৃশ্যই থাকে—

রানার চলেছে, রানার।
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্যাসিবাদের প্রতিস্পর্ধী কবি সুকান্ত

একদিকে পুঁজিবাদ আর ফ্যাসিবাদ।

আর একদিকে নবোদ্ভূত সমাজতন্ত্রবাদ।

মধ্যে যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পুঁজিবাদের প্রতাপ ভয়ংকর, তার রূপ ও স্বভাব বীভৎস! পশুকেও হার মানায়। সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ, দৃপ্ত পদচারণা এই পুঁজিবাদের ওপর।

সুকান্তর কবিতা রচনার কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষিত। এই সময়—সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ অহংকার নিজের ভিতরের বিরুদ্ধ শক্তিতেই জরাগ্রস্ত হওয়ার মুখে। না, আর পুঁজিবাদ তাকে বাঁচাতে পারছে না। পারছে না সাম্রাজ্যবাদের রাজবেশ-চকিত সিংহাসনকে।

সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসন আসন্ন ভয়ংকর ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের মত মৃদু কম্পনে ভীত-সন্ত্রস্ত!

সম্মুখে আসন্ন সমাজতন্ত্রবাদ—যার আগমনেই বিশ্বরূপ!

যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদের হাতের যাদুদণ্ড যা দিয়ে সে সমস্ত শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে নতুন করে সাম্রাজ্য শাসনের নিষ্ফল স্পর্ধা রাখে।

উনচল্লিশ সালের যুদ্ধ এলো। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের রূপের পরিবর্তন। বীভৎস ফ্যাসিবাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আর মরণপণে সারা পৃথিবী তখন সাময়িকভাবে হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

পুঁজিবাদ যার রত্নখচিত সিংহাসন, সেই সাম্রাজ্যবাদ তখন যুদ্ধের যাদুদণ্ড হাতে ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত। সাম্রাজ্যবাদ অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

রাবণের মৃত্যুবাণ যে তার ঘরেই ! রাবণের শক্তির সমস্ত নিঃশক্তির অবস্থা যে তার মধ্যেই !

জটিল জালের মধ্যে যে রাজা নন্দিনীর কথায় বার বার বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়, সেই রাজার মৃত্যু যে তার অন্ধকার জালের মধ্যেই !

জানে না, বোঝে না তারা।

সাম্রাজ্যবাদও বোঝেনি কখন নিজেই নিজের কবর তৈরী করতে বসেছে যুদ্ধ বাধিয়ে !

যুদ্ধ—বিশ্বযুদ্ধ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ !

এর একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বকলমে বন্য ফ্যাসিবাদ, আর একদিকে সমাজতন্ত্রবাদ—জাতীয় ঐক্যের বজ্রনির্ঘোষ—আন্তর্জাতিক ও বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের প্রবলতম জোয়ার।

সুকান্ত কালের ক্রীড়নক নয়, কালের টীকাকার, মহাকালের উপযুক্ত সঙ্গী।

সুকান্তর রচনা এমন ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের যোযুদ্ধমান কালে !

তাই সুকান্তর কবিতা দ্বিধার হয়নি, দ্বন্দ্বে দোলাচল হয়নি, স্পষ্টত ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। সুকান্ত লিখে চলে একাধিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা।

সুকান্তর কবিতায় যে অবিরাম যুদ্ধ ঘোষণা, তা শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, ফ্যাসিবাদকে মনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য, বলা ভাল, সৃষ্ট সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেও !

ইউরোপে শুরু হল যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী করা যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের ধর্ম অমানবিক শোষণ, বিচারহীন শাসন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে তখন ভারত। সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রিত এদেশীয় সামন্ততন্ত্রের আর কালোবাজারী আড়তদার মুনাফাখোর-মজুতদারদের কৃমিকীটের মত আচরণ দেখা দিল।

যুদ্ধের দুই রূপ—দেশের বাইরে, ভিতরে।

এ ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদীরা বিভক্ত হয় দুই শিবিরে—পুরনো সাম্রাজ্যবাদী আর নতুন সাম্রাজ্যবাদী—দুই দলে।

সাল উনিশ শ একচল্লিশের মাঝামাঝি।

প্রথম দলে আমেরিকা, বৃটিশ ইত্যাদি। দ্বিতীয় দলে জাপান-জার্মান ইত্যাদি নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মুখবিম্ব!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ এই সাম্রাজ্যবাদী দুই শিবিরেরই অন্তঃশীল অন্তর্বিরোধের মোক্ষম ফল।

এই দুই সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরের যুদ্ধ শুরু হয় উনিশ শ উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রায় দেড় বছর পরেই সমস্ত রকম শাসন-শোষণের চিরশত্রু সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুখ ফেরায়!

সাল উনিশ শ একচল্লিশের বাইশে জুন!

নাৎসী জার্মানীর আক্রমণ, পীড়ন, বর্বরতা, চীনে নৃশংসতায় হাত পাকানোর পর জাপানের উপনিবেশ ছিনিয়ে নেওয়ার অসম্ভব তৎপরতা—এমন সব ঘটনা এই একচল্লিশ সালেই ঘটে যুদ্ধের অমোঘ নিয়মে।

কিন্তু জনগণ তখন সংঘবদ্ধ হতে উন্মুখ। পশ্চিমী জনগণের বিপুল চাপে ও আত্মরক্ষার প্রেরণায় এবং একই সঙ্গে রাশিয়ার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জঙ্গী সংগ্রামী চেতনার কারণে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধী এক মিত্রশক্তির কোয়ালিশনের সমর্থক হয়ে ওঠে জনগণ।

জলমগ্ন মানুষের ঈষৎ শ্বাসটুকু নিয়ে বাঁচার প্রয়াস! নিয়তির মত ইতিহাসের নিয়ম, গতিও!

এমন সমর্থন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে হয় মৃত্যু-দলিলে স্বাক্ষরের মত!

বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক এই অবস্থায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে এক অগ্নিপরীক্ষার কাল উপস্থিত।

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদের হীনবল হওয়া—এটাই মহাকালের নির্দেশ।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল, পঙ্গু, বিতাড়িত করার পক্ষে দরকার—

এক : ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল দুর্মদ মমতাহীন সংগ্রাম।

দুই : বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল চাপসৃষ্টি ও তার সঙ্গীদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করার জন্য চাই জনগণের নিরঙ্কুশ ঐক্য।

তিন : যুদ্ধান্তের প্রাপ্য হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শ্রমিক ও শোষিত মানুষের একতাবদ্ধ মজবুত সংগঠন।

সুকান্তর কবিতায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণে এই তিন শপথ যেনবা ভারতীয় প্রাচীনতম ঋষিদের মত ওঁ মন্ত্রে দীক্ষিত, দীপ্ত!

যুদ্ধের সূত্রে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর চরিত্র সম্পর্কে আভাসে ইঙ্গিতে বা স্পষ্ট ভাষায় সেকালের দেশীয় দল, রাজনীতিবিদ, নেতা ও বহির্ভারতের যুদ্ধরত প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্য কি?

সোভিয়েত ইউনিয়নে হের হিটলারের নাৎসীবাহিনীর প্রচণ্ড অত্যাচার তখন শুরু হয়ে গেছে। কিছুকাল পরেই উনিশ শ' একচল্লিশ সালের তেসরা জুলাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে এক চমৎকার ভাষণে কমরেড স্তালিনের ভাষ্যের সারমর্ম হল —সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তা সাধারণ, উপেক্ষণীয় নয় আদৌ। জার্মান ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধেই রাশিয়ার জনগণের সার্বিক মুক্তিপণের যুদ্ধ। সারা ইউরোপ যেখানে জার্মান ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এ নাগপাশের বন্ধনের মত পর্যুদস্ত, অপমানে অধোমুখ, তখন সেই অপমানিত, ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এ বিপদগ্রস্ত রাজ্য, জাতি তথা মানুষকে মুক্ত করাই ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধের তাৎপর্য ও লক্ষ্য।

চিরকালের মানব্যের পক্ষে, তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিশ্ব-রাক্ষসের বিরাট মুখব্যাদানকে উপেক্ষা করে উনিশ শ' একচল্লিশের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব—

'দি সোভিয়েট ইউনিয়ন হ্যাজ স্টুড ফর সার্টেন হিউম্যান, কাল্‌চারাল্‌ ভ্যালুজ এ্যাণ্ড সোস্যাল ভ্যালুজ হুইচ্‌ আর অফ গ্রেট ইম্পর্ট্যান্স টু দি গ্রোথ এ্যাণ্ড প্রোগ্রেস অফ হিউম্যানিটি।'

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রবলতম ধিক্কারকণ্ঠ—

'ইট ডিসট্রেসেস মি দ্যাট মাই ইণ্ডিয়ান স্প্যাড টক অফ্ দি জাপানিজ্ লিবারেটিং ইণ্ডিয়া।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন ফ্যাসিজ্ম্-এর স্বরূপকে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে, জনযুদ্ধের ব্যাখ্যাকে এবং মিত্রপক্ষের জয়যাত্রার তাৎপর্যকে নানাভাবে দেশীয় সচেতন-অসচেতন মানুষের কাছে বিশ্বাস্য করে রাখায় সচেষ্ট। এই অবস্থায় ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক দল, গোষ্ঠী, সাহিত্য, গান, সংগঠন দেখা দিতে থাকে একের পর এক।

কবি সুকান্ত, রাজনীতিকে হৃদয়গত করতে উন্মুখ সুকান্ত, কর্মী ও সংগঠক হওয়ার শিক্ষায় রত সুকান্ত তখন এই দলে। তার দায়িত্ব-পালনে সে তখন নিরলস।

কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই বা অল্প কিছু পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়েই উনিশ শ' চল্লিশ সালের উনিশে আগস্ট 'পূর্বাভাস' নামে কবিতায় যেনবা ভবিষ্যদ্বাণী করে বসে—

সন্ধ্যার আকাশতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁর ম্লান হয়ে আসে।
বুভুক্ষু প্রেতেরা হাসে শাণিত বিদ্রূপে,

*   *   *

ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে তোলে আর্তনাদ।

এ বুঝি কবির সাবধান বাণী! একচল্লিশের ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের ভূমিকা বুঝি নিঃশব্দে তৈরী হতে থাকে সুকান্তর কবিতায় ফ্যাসিবাদ প্রকাশের যথার্থ রূপাবয়বে। সম্মান লাঞ্ছিত, তার দৃষ্টিতে ভীরুতার প্রলেপ।

ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তার সঙ্গে জড়ানো মরণের ছায়ায় সত্য! সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের মূল্যবান 'বাই প্রোডাক্ট' ফ্যাসিবাদ নিয়তির তিলক ভালে চিহ্নিত করেই বুঝি জন্ম নিয়েছিল, না হলে

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কিশোর কবি সুকান্ত কেমন করে বলে ওঠে এই 'পূর্বাভাস' কবিতারই মধ্য অংশে—

দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ—
বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়।

কবিতাটিতে 'কালো মৃত্যু', 'মৃত্যু অভিমান'—এমন সব শব্দ প্রয়োগ করে সুকান্ত ফ্যাসিবাদের একটা ইঙ্গিত-গর্ভ অবয়ব আগেই রচনা করে!

বিশ্বকবি, 'নন-পলিটিক্যাল ম্যান' রবীন্দ্রনাথকেও সামিল করে সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতারা একসময়ে এক ফ্যাসিবিরোধী সংঘ গড়ে তোলেন উনিশ শ' তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যকার এক সময়ে। এমন ঘটনা বালক সুকান্তর সেই সংঘ-চেতনাকে সামান্যতম অংশে হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করতে অক্ষম।

কিন্তু উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের আটই মার্চ ভারতের বাইরে জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে শ্রমিক-মিছিলের যাত্রী লেখক সোমেন চন্দকে যেভাবে গুপ্ত হত্যাকারী ছিনিয়ে নেয় মিছিল থেকে হত্যার অবর্ণনীয় মানবতাবিধ্বংসী নৃশংসতায়, তার প্রতিবাদী চমৎকার রূপ 'ছুরি' কবিতায় বুঝিবা কবরের ওপর স্মৃতি-ফলকে খোদাই করার মত লিখে দেয়—

দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত,
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্‌ বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।

ফ্যাসিবাদের স্বরূপ, ফ্যাসিবাদীরা শুধু সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেই মরে না, মঞ্চের নেপথ্যে থেকেও মরণবান বুকে নেওয়ার জন্য ভ্রান্ত পথে পদক্ষেপ করতে চায়, সুকান্তর 'ছুরি' কবিতায় তারই ইঙ্গিত।

শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের করিনা আজ গণ্য।

ভুলেছে যারা সভ্য-পথ, সম্মুখীন যুদ্ধ,
তাদের আজ মিলিত মুঠি করুক শ্বাসরুদ্ধ,
শহীদ গুণ আগুন জ্বালে শপথ অক্ষুণ্ণ :
এদেশ অতি শীঘ্র হবে বিদেশী-চর শূন্য।

প্রধান লক্ষ্য করার বিষয়, সুকান্ত শহীদের রক্ত আগুন হয়ে ওঠার চিত্রকল্পে, শ্বাসরুদ্ধ করার মত নির্মমতার ভাষণে যে ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিদ্রোহকণ্ঠকে সোচ্চার করেছে, তা লক্ষ লক্ষ অস্ত্রের আঘাতের ভয়াবহতা থেকেও অমোঘ, ভয়ংকর পরিণামী প্রাপ্যের যথাযথ নির্দেশক।

'ছুরি' কবিতার প্রথমাংশে ফাসিবাদের স্বরূপ, মধ্য অংশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার তো কম, স্পষ্ট ক্রোধোন্মত্ত বিদ্রোহ, এবং শেষে ফ্যাসিবাদের অন্ধকার, অন্ধ, উন্মত্ত, মরণোন্মুখ দৈত্যের রূপের সামনে বিরাট মানব-প্রাণের আশা ঘোষণা—

বাঁচাব দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী॥

বাংলাদেশে ঢাকায় বিদেশীদের নিযুক্ত দেশী গুপ্তচরদের হাতে সোমেন চন্দের হত্যা প্রমাণ করে, ফ্যাসিবাদ তার 'জননীর গর্ভের লজ্জা'।

সমস্ত দল সমস্ত মত এককাট্টা হয় সোমেন চন্দের মৃত্যুতে তীব্র নিন্দা, ঘৃণা, ধিক্কার জানাতে।

জন্ম হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র।

উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের পয়লা এপ্রিল এই সংঘের মাসিক মুখপত্র বিপ্লবের রক্তচোখ নিয়ে দেখা দেয়। নাম : 'জনযুদ্ধ'।

পত্রিকা, নাটক, গান, কবিতা, মিছিল, শ্লোগান, ছবি, দেওয়ালে রাজনীতি তথা মানবনীতির দেওয়াল-লিখন—এসবের অন্যতম কর্মী, শিল্পী ক্রমশ যেমন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আত্মনিয়োগে উন্মুখ হয়ে ওঠে, তেমনি কাব্যচেতনায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাকে একমাত্র মন্ত্র হিসেবে মেনে নেয়।

জাপান তখন ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ট শক্তি। ভারতব্যাপী জাপানী আক্রমণ তখন অব্যাহত। তাদের কোকোনদ, ভিজাগাপত্তমে, ফেণী ও চট্টগ্রামে একভাবে বোমাবর্ষণ অব্যাহত থাকে।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের এপ্রিলের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তীকাল।

এই সময়-পরিধিতেই জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'জনযুদ্ধের গান' সংকলন। প্রথম সংস্করণে সুকান্ত অনুপস্থিত। প্রায় মাস দুয়েক পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ হলে সুকান্তর 'জনযুদ্ধের গান' কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কবি সুকান্তর ফ্যাসি-বিরোধিতা যে কি অন্তরঙ্গ, কি তেজী, গর্বিত বিষয়, তার প্রমাণ এই 'জনযুদ্ধের গান'।

জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলেছে ভারত আর বীর মহাচীন।
সাম্যবাদীরা আজ মহাক্রুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।
*   *   *
করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ;
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।

তীব্র ফ্যাসিবিরোধিতার জন্য এক দেশপ্রেমিক সচেতন কবির সার্বজনীন উদাত্ত, আবেগাত্মক আহ্বান!

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সারা বিশ্বের ফ্যাসিবাদের একমাত্র এজেন্ট অর্থাৎ তল্পিবাহক জাপানী সাম্রাজ্যবাদ। 'উদ্যোগ' কবিতায় সুকান্ত সেই ফ্যাসিবাদী পশুশক্তির নাম দেয় 'দুর্বৃত্ত', 'মূঢ় শত্রু', হানাদার 'যুদ্ধের দূত'। কিন্তু সুকান্তর সব সময়ে কণ্ঠে এক কথা—'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি'।

'উদ্যোগ' কবিতায় সেই রকমের নির্দেশ—

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে সুকান্ত একবারও যথার্থ উত্তরাধিকারীদের চিনতে ভোলেনি। ভোলেনি কারা ফ্যাসিবাদের যথার্থ প্রতিবাদী শক্তি—

ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে

* * *

আজকে মজুর হাতুড়ির স্বর ক্রমশই করে দৃপ্ত,
আসে সংহতি। শত্রুর প্রতি ঘৃণা হয় নিক্ষিপ্ত।

শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীই যে ফ্যাসিস্ট শক্তি-ধ্বংসের শক্তিধর—কমিউনিস্ট সুকান্ত তা ভোলেনি। 'উদ্যোগ' কবিতার শেষে দুর্ভেদ্য প্রাণ নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ে হানাদার যুদ্ধের দূতকে বাধা দেওয়ার কথা ব্যক্ত। ফেণী ও আসামের, চট্টগ্রামের ক্ষিপ্ত জনতার আন্দোলনের গর্জনকে স্মরণ করে আবার যেনবা কবিতার ধুয়ার মতই মনে করিয়ে দেয়—

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত ॥

'জবাব' কবিতায় ফ্যাসিবাদের শক্তির কথা, শত্রুদলের গোপন ক্রিয়াকাণ্ডের কথা মনে রেখেই যেন প্রশ্ন—

পতেঙ্গার রক্তপাত
আনেনি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে ?

সংগে সংগে পরবর্তী পংক্তিতেই কবির উত্তর, বুঝিবা নির্ভয়তার বাণী—

উষ্ণমন শাণিত হোক সংগীনে।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমানবন্দরে যে নিদারুণ রক্তপাত ঘটায় ফ্যাসিশক্তি আকস্মিক বর্বরোচিত আক্রমণে, তারই জবাব কবিতাটির শেষতম সিদ্ধান্তে—

তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির ॥

'জবান' নামের সমগ্র কবিতার মধ্যেই সুকান্ত ফ্যাসিবাদের রূপ, স্বরূপ এবং কবির প্রতিবাদী চিন্তা ওতপ্রোত করেছে।

'চট্টগ্রাম : ১৯৪৩' কবিতায় ফ্যাসিবাদের রূপ—

বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন ;
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম :
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে
তাই আজো শত্রুরা সাহসী ।

সাহসী শত্রু ফ্যাসিবাদ পাশবিকতার দুঃসহ মহড়া চালায় বিক্ষত বিধ্বস্ত-দেহ চট্টগ্রামের ওপর। এমন ফ্যাসিবাদ স্মরণেই কবির মন ভিতরে ভিতরে কঠিন বজ্র ও বর্ষণোন্মুখ জলভারে ভারাক্রান্ত মেঘের মত গুমরে ওঠে।

কবিতাটির শেষে যেন মেঘমন্দ্রিত স্বরে এক আধুনিক সচেতন 'প্রফেট' কবির গম্ভীর কণ্ঠের সত্যভাষণ বা দেবভাষণ—

অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নগর।
এখনো হয়নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।

ফ্যাসিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সুকান্তর ছিল বিশ্বচেতনা। জাপানী ফ্যাসিস্টের আক্রমণ শুধু উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে তার মনে। ফ্যাসিস্ত শক্তি সুদূর রাশিয়ার স্তালিনগ্রাদেও। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কবির শপথ রক্তের শপথ, বিপ্লবের বিদ্রোহের শপথ, লাল শপথ—

তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥

উনিশ শ বিয়াল্লিশের উনিশ ও বিশে ডিসেম্বর। কলকাতায় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

আবার বিশ থেকে পঁচিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতার বুকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সবরকম মানবতা-বিধ্বংসী প্রত্যক্ষ ভয়াবহ রূপ।

এ সময় কমিউনিস্ট চিন্তায় সম্পূর্ণ দীক্ষিত সুকান্তর একটি পত্রের অংশ—

'এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা।'

এই দৃঢ়তার স্বীকৃতি আছে সমস্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কাব্য-ভাবনায়। আছে 'পরিখা,' 'জবাব,' 'বিবৃতি,' 'লেনিন,' 'জাগবার দিন আজ'-এর মত একাধিক উজ্জ্বল-দীপ্ত কবিতায়।

'পরিখা' কবিতায় কবির জিজ্ঞাসা—

> হতাশা নিয়েই নিত্য তোমার দাদন শেষ?
>
> *　　　*　　　*
>
> পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
> পথ নির্জন, রাত্রি বিছানো অন্ধকারে।

ফ্যাসিবাদকে এবার বিশ্বপ্রেক্ষিতে রেখে কবি তার স্বরূপ ও অসহায় অবস্থার প্রতিচিত্রণ আঁকে কবিতার উপসংহারে। মার যে দেয় নিরন্তর, সে মার খাওয়ার কথা ক্রমশ ভুলেই যায়। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা তাকে আবার মনে করিয়ে দেয়। তবে যখন তাকে মনে করায়, তখন নতুন ইতিহাসের হাতে দলিল। সে দলিলের প্রথম অংশে একের মৃত্যু-নির্দেশ, আর একের জন্মযন্ত্রণার কাতর ধ্বনি।

ফ্যাসিবাদ সারা বিশ্বে দাপটের সঙ্গে এগোতে গিয়ে নিজেকেই বিস্মৃত হয়ে যায়। পথে ধাঁধা লাগে, বিচারবুদ্ধি লোপ পায় একে একে। একটা কঠিন পাহাড়ের শক্তগাত্রে তার আছড়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আর তার যখন আকুল কান্নার মধ্যে মরণের বিশাল ছায়া নেমে আসে, তখন আর এক উষার আলোয় আলোকিত, সমবেত সমস্বরে ধ্বনিত বিশাল বিশ্বপ্রাণের মানুষ ভোরের গান গেয়ে ওঠে।

'পরিখা'-র উপসংহারে ফ্যাসিবাদের সেই মৃত্যুর ফাঁসে জড়িয়ে পড়ার চমৎকার চিত্র!

মরণের আজ সর্পিল গতি বক্রবধির—
পিছনে ঝটিকা, সামনে মৃত্যু রক্তলোলুপ।
বারুদের ধূম কালো ছায়া আনে,—তিক্ত রুধির;
পৃথিবী এখনো নির্জন নয়,—জ্বলন্ত ধূপ।
নৈঃশব্দ্যের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে॥

ফ্যাসিবাদের অত্যাচারে যে ক্ষত সে ক্ষত সমাজদেহের গভীরে বিস্তৃত হয় গোপনে। বোমার আক্রমণে ধ্বংস হয় ঘর, বাড়ি, সম্পদ। মৃত্যু হয় মানুষের। কিন্তু সে তো তার বাইরের দিক। ভিতরের দিকে ফ্যাসিবাদের পরোক্ষ ছায়া ভয়াবহ। আনে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, হাহাকার, অসহায়তা, মানবতাবিরোধী জীবন-ভাবনা!

এমন ফ্যাসিজম্-এর ফলেই 'বিবৃতি' কবিতায় কবির খেদ—

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

এমন মৃতের ওপর, অসহনীয় বুভুক্ষার মধ্যে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের থেমে-যাওয়া নেই! এর মধ্যেও তার স্বরূপ বড় নৃশংস, বড় ঘৃণ্য।

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকট নাশন।
সহসা অনেক রাতে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।

সুকান্তর কবিতা লেখার বয়স বাধা হয়নি, কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা অর্জনে বয়সের বেশী পৌরুষ অলৌকিক প্রতিভার কাজ করে এসেছে।

রাজনৈতিক মত ও পথ-ভাবনার জটিল জিজ্ঞাসায় ডুবে না গিয়ে এক বন্ধুকে কবিভাষায় জানায় ফ্যাসিস্টদের প্রতি দেশীয় দল মতের ভুল ধারণার কথা। মূলত ব্যঙ্গ-রসে সিক্ত করে সুকান্ত লেখে—

আমাদের যখন দরকার
জাপান সরকার
ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক
কিন্তু ক-টা অবাধ্য চৈনিক
অন্তরায়
আমাদের স্বরাজ পাওয়ায়।
আর অন্তরায় শুধু সাম্যবাদী দল
স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানীর ছল।
—একথা রাষ্ট্র করে তারা
বৃটিশের গৌরীসেনা অর্থে পুষ্ট যারা।

ফ্যাসিবাদ ও ভারতে ফ্যাসিশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে সুকান্তর ধারণা সমকালের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মতপুষ্ট মানুষদের জটিল মত-কলহের থেকে মুক্ত। এই মুক্ত মন ছিল বলেই এই ব্যঙ্গে আছে সত্য-দৃষ্টি এবং ফ্যাসিশক্তি সম্পর্কে দক্ষ নির্ভুল জ্যোতিষীর গণনার মত প্রমাণ।

'জাগবার দিন আজ' কবিতায় সুকান্তর তাই স্পষ্ট কথা—

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়াছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।

ফ্যাসিশক্তি মূলত সমবেত মানবের মৃত্যু শক্তি। মরণবাণ নিয়েই তার যত কিছু দম্ভ, যত বড় পদ-ভার! সেই শক্তি সম্পর্কে সচেতন কিশোর কবির ঘোষণা—

আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে, আজ আর নেই কোনো নিস্তার;

মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট,
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট,

দেশের মধ্যে যথার্থ শত্রু চিনতে যারা ভুল করে এমন মৃত্যু-চিত্র প্রসঙ্গ তাদের কাছে সাবধানবাণী। ফ্যাসিবাদকে কবি বলে 'দৈত্য', 'দানব'। 'জাগবার দিন আজ' কবিতায় সেই দৈত্য সম্বন্ধেই শপথ উচ্চারণ—

পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে ;

ফ্যাসিবাদ বনাম সমাজবাদের যুদ্ধ এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট শক্তিকে এখনো চিনতে ভুল করে ভারতের কিছু মানুষ। 'মণিপুর' কবিতায় কবির তীক্ষ্ণ তর্জনী তুলে কঠিনতম প্রশ্ন, সেই সঙ্গে উত্তরও—যেনবা বক্রোক্তি জাতীয় আলংকারিক ভাষণ—'এ্যাফার মেশান' ও 'কোশ্চেন' থেকে 'নেগেশানে' বার বার ধ্বনিত হওয়া—

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা বিধ্বস্ত বাংলাকে?

ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিশক্তি সম্পর্কে রক্তচক্ষু কবি ক্ষমাহীন, অবাধ্য। কবি সুকান্তর বাসনা—

দাসত্বের ছদ্মবেশ দীর্ণ করে উন্মোচিত হোক
একবার বিশ্বরূপ—

কারণ ফ্যাসিবাদ তো বহুরূপধারী সেই নীলবর্ণ শৃগালের মত। নিলজ্জ দাম্ভিক, মানব্য-হননকারী। ফ্যাসিস্ট মুখোশকে সুকান্ত ঠিক মতই চিনে রেখেছিল। তাই তার অকপট ও নিপুণ কাব্যিক বিশ্লেষণ—

শত্রুরা নিয়েছে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ
তবু কেন নিরুত্তর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা দেশ?

যুদ্ধের কয়েকটি বাস্তব ঘটনা তখন কবির সামনে।

লালফৌজের দৃপ্ত অগ্রগমনে হিটলারের নাৎসীবাহিনীর অসহায় পরাজয় পর্ব আরম্ভ।

উনিশ শ তেতাল্লিশের মার্চমাস। ইতালির বিপুল শ্রমিক সংগঠনের

ডাকে ধর্মঘট ও নিম্নমুখগামী সমুদ্রজলের মত প্রবলতম বিক্ষোভ। মুসোলিনীর পতন।

এর আগে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, বলকান অঞ্চল, আফ্রিকার কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়।

লেখা হল 'রোম ১৯৪৩।' এরই সংগে সুকান্ত লেখে বিখ্যাত 'লেনিন' কবিতা।

এমন সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে সুকান্তর লেখনী সত্যভাষণ করে সংবাদ ও কবিতা মিশ্রিত করে—

আজকেও অযুত লেনিন—
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ,
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

ঠিক যেভাবে ফ্যাসিবিরোধিতা সুকান্তর কবিতায়, ঠিক সেই আবেগেই ফ্যাসি-ধ্বংসের কথা কবিতায় চিত্রিত।

হিটলারের বার্লিনের পতনের পরেও ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ শেষ হয়নি পূর্ব রণাঙ্গনে। জাপানী ফ্যাসিজ্‌ম্ তখনো তৎপর প্রাচ্যে! মুসোলিনীর পতন, হিটলারের পরাজয়। এই দুই শক্তির স্তব্ধতায় জাপান হয় হীনবল, হৃতবল।

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ।

ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রবক্তা অক্ষশক্তির এক অঙ্গ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আত্মসমর্পণ ও সম্পূর্ণ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিসমাপ্তি!

সুকান্তর কবিতায় ফ্যাসিবাদই সমস্ত বিষয় বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে। ফ্যাসিবাদের রথচক্রের দুর্দান্ত চলায় আসে মন্বন্তর, মৃত্যু, হাহাকার, দুষ্ট ক্ষতের মত দাঙ্গা!

আবার এসবের প্রতিপক্ষ ও প্রতিবাদী হয় মানবতার উচ্চ ঘোষক বিপ্লব, বিদ্রোহ, গণবিক্ষোভ, আন্দোলন, পবিত্র সমাজবাদে দীক্ষিত সাম্যবাদ। সুকান্তর কিশোর মনে অভিজ্ঞতার ফসলে সে যৌবনের

সবুজ আবেগ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কবিতায় তার নিপুণ এবং অবধারিত স্বাক্ষর।

কবি সুকান্ত সে সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন তখন। ফ্যাসিবাদের শক্তির এক রূপ। কিন্তু তার পরাজয়ের পর প্রাপ্য স্বাধীনতায় যে বিরুদ্ধ শক্তি সক্রিয়, সেও আর এক পশুশক্তির রূপ। তাকে আঘাত হানার কৌশল স্বতন্ত্র ধরণের।

কবি সুকান্তর কাব্য-ভাবনা তাই আবার নতুন দিকে মোড় ফেরে।

> মাভৈঃ, রানার! এখনো রাতের কালো।
>
> *　　　*　　　*
>
> রানার! গ্রামের রানার
> সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;

চতুর্থ অধ্যায়

হা-অন্নের তেরশ' পঞ্চাশ ও কবি সুকান্ত

উনিশ শ তেতাল্লিশ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তর!

যেন এক কর্কট-রোগাক্রান্ত মানুষের শরীরে দুষ্ট ক্ষত!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশে এই সময় এক গভীর অবক্ষয়ের ছায়ায় ভয়াল। রূপকথার রাক্ষসীর মত বীভৎস তার রূপ-স্বরূপ!

সে সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে ঝড়—তা যেন বিশ্বযুদ্ধের প্রতি, সাম্রাজ্যবাদী মানুষের প্রতি আর দেশীয় রাজনীতিবিদদের সুবিধাবাদী স্বার্থসর্বস্ব হঠকারিতার প্রতি আক্রোশপূর্ণ অভিশাপ। তেতাল্লিশের ঝড় যেন পৃথিবীর সমস্ত শকুনি-গৃধিনীদের সমবেত শ্বাসের প্রবল প্রতিরূপ।

কিন্তু প্রাকৃতিক সুযোগ ছাড়াও উঁচুতলার মানুষ কি রকম?

তার উত্তর আছে সুকান্তর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কবিতায়।

দেশীয় মন্ত্রিসভা তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক নাজিমুদ্দীন সাহেবের! তাঁর লালিত দুর্ভিক্ষে 'কলকাতার রাজপথে জীবিত কঙ্কাল ও মৃত নরনারীর' দেহের বুঝিবা মিছিল! বাংলাদেশের সেকালের অপদার্থ শাসক-কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্য বা অযোগ্যতা, 'ঘুষখোর মুসলীম লীগ মন্ত্রীর দল এবং অযোগ্য কর্মচারী'দের অবিবেচনাপ্রসূত খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থাই এমন ভয়াবহ মন্বন্তর সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

কিশোর কবি সুকান্ত এদের এবং এই সময়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার শাসনকালের আর এক কলঙ্কজনক দিক—অন্নের পাশাপাশি বস্ত্রসংকট সৃষ্টি।

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের দশই মার্চ 'বস্ত্র সংকট দিবস' হিসাবে প্রতিপালিত। ওয়েলিংটন স্কয়ারের জনসভায় সে সময়ে বিখ্যাত

বক্তা—বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশংকর রায়, ভূপেশ গুপ্ত, বসন্তলাল মোরারকা, যোগেশ গুপ্ত, ভগীরথ কনোরিয়া প্রমুখ সৈয়দ নৌসের আলির সভাপতিত্বে তীব্র ধিক্কারে সোচ্চার।

কিন্তু এত বড় প্রতিবাদ, মিছিল, সভা সত্ত্বেও সরকারী ও বেসরকারী উভয় শ্রেণীর মধ্যে কালোবাজারী, মুনাফাখোর ব্যবসাদারের টাকার খেলা, ইঁদুর জাতীয় স্বভাবের গোপনতায় ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার সুনিপুণ কৌশল অব্যাহত। কেন্দ্রীয় বৃটিশ সরকারের নির্মম উদাসীনতা ও অজ্ঞতা, কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে বিধান পরিষদের সদস্যদের ভোটের বিনিময়ে ব্যবসাদারদের মোটা টাকার উৎকোচ প্রদান—এমন সব কারণ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের মূল—একথা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যে প্রমাণিত।

কিশোর কবি সুকান্ত এদের এবং এই সময়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা!

সুকান্ত কবি বলেই তার দেখা শুধু রাজনীতিতে, সংগঠন পরিচালনায়, সভা-মিছিলে অংশগ্রহণে, পোস্টারে প্রতিবাদী ভাষা অংকনেই নিঃশেষ হয়নি, ভয়ংকর কণ্ঠের শক্তি অর্জন করে কবিতায়—কবিতার বলিষ্ঠ শব্দ, চিত্র, ছন্দ, ধ্বনি ও সিদ্ধান্তের সমবেত ফলশ্রুতি ও তাৎপর্যে!

বহির্বিশ্বে, সেই সূত্রে ভারতে তথা বাংলাদেশের সীমান্তে ও মধ্যে যুদ্ধের দামামাধ্বনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের জনজীবনে, মাঠে-ঘাঠে ঘরে মানুষের মনে শুধু অন্ন-বস্ত্র টুকু নিয়ে বাঁচার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম! মধ্যে কিছু ফড়িয়া—অসৎ, অসাধু ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী, রাজ-নীতিবিদ—মুনাফাখোর, কালোবাজারী মজুতদার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া আর এক 'জননীর গর্ভের লজ্জা'র দলভুক্ত মালিক, মজুতদার, মুনাফাখোর!

সব মিলিয়ে অনাহারে পীড়িত মানুষ আর স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি—একদিকে শোষণ আর একদিকে শোষক—নবোদ্ভূত এই দুই শ্রেণীর প্রত্যক্ষ চিত্র আছে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে, আছে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প-উপন্যাসে, আছে প্রত্যক্ষ

মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে লেখা বেশ কিছু কবিতায়। তেরশ পঞ্চাশ অর্থাৎ উনিশ শ তেতাল্লিশ সালেই লেখা দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের ওপর কবিতা নিয়ে সুকান্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আকাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশকাল তেরশ' একান্ন।

নতুন সংস্করণ—যা সুকান্তর মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে প্রকাশিত, তার 'নতুন আকাল' শিরোনামায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—'পড়ে দেখুন, আজও মনে হবে এর কাব্যবস্তু একেবারে টাটকা তরতাজা।···দেশকালের মানুষ হিসেবে এতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার কথা। আমাদের মাথার ওপর আজ আবার উদ্যত আকালের খাঁড়া। বিদেশী শাসকদের বদলে আমাদের বহু বাঞ্ছিত স্বাধীনতার পতাকার নীচে আজ দেশী লুটেরাদের রাজত্ব। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকারে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।'

দুর্ভিক্ষের, মন্বন্তরের, মানুষের উপবাসী উদর নিয়ে, বস্ত্রহীন নগ্নদেহ নিয়ে আর্তচীৎকারের স্বরূপ সুকান্তর কবিতায় কিরকম?

এই প্রশ্নের উত্তর আছে সুকান্তর 'আকাল' গ্রন্থের 'কথামুখ' রচনার প্রথমেই। তার কবিতায় দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ আরও পরের কথা।

যুদ্ধ-সমকালীন, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের অসংখ্য জীবিত-মৃত ও মৃত মানুষের ভূত-প্রেতসুলভ ছায়ায়, অশরীরী অলৌকিক ভয়াল পরিবেশে বসে কিশোর কবি লেখনী থামিয়ে, কঠিন তর্জনী তুলে আশপাশের ছোট বড় সমস্ত কবিদের প্রশ্ন করে। প্রশ্নের সংখ্যা চার।

এক. 'বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব অনাহার পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন?'

দুই. 'তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র?'

তিন. 'তাঁদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত?'

চার. 'এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি?'

এক তরুণতম কবির এগুলি ভয়ংকর কঠিন প্রশ্ন।

বস্তুত এমন চারটি প্রশ্ন বুঝিবা কবির আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবীক্ষণ! সমস্ত কর্মক্লান্ত দিনের অবসরে গভীর রাতে লেখনী হাতে নিয়ে অভিজ্ঞতার রক্তস্বাক্ষর রাখবার সময় আকস্মিকভাবে কবিতা লেখার কাগজটি আয়না হয়ে সামনে ভেসে ওঠার সংগে সংগে কবিরই যেন আত্মবিম্বনে প্রশ্ন রাখা!

'কথা-মুখ'-এর এমন প্রশ্ন কবির নিজেকেই!

এমন প্রশ্নের উত্তর হল কবির অসংখ্য কবিতা!

'কথামুখ' অংশে সুকান্তর যা স্বীকৃতি, তা তার সমস্ত মন্বন্তরের কবিতারও স্বীকৃতি!

'তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘর ভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।'

গদ্যের এমন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কবির অনুভবে, কাব্যময়তায় সুকান্তর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কবিতাকে করেছে স্ব-কালের তথা শাশ্বতকালের অবহেলিত, উৎপীড়িত মানব-আত্মার তমস্সুক!

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কর্মী, সাংবাদিক সুকান্ত আর কবি-সুকান্ত এক এবং অদ্বিতীয়। রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণে যেমন সম্পর্ক, সমুদ্র-জলের সংগে তরঙ্গের যেমন সম্পর্ক, তেমনি সম্পর্ক দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের নিরলস, নিবেদিত-প্রাণ কর্মী ও কবি সুকান্তর!

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মধ্যে সাম্যবাদী ভাবনায় দীপিত, দীপ্ত ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এক কিশোর-পুরুষ সুকান্ত তখন নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবক —সৎ, একনিষ্ঠ, নিজের বিচার-বুদ্ধিতে প্রবল আস্থাশীল।

এরই নাম কি দেশপ্রেম?

সুকান্ত যে কতবড় দেশপ্রেমিক তার কর্ম, ধর্ম, মর্ম তার প্রমাণ দেয়।

আর তার কাব্য?

দেশপ্রেম থেকে আন্তর্জাতিক প্রেমচেতনায় বিস্তৃত।

কাল থেকে মহাকালে তার উত্তরণ।

অতি ধীরে কালের বিষ পান করতে করতে কিশোর কবি একুশ বছর বয়সেই হয় নীলকণ্ঠ।

একটি চমৎকার স্মৃতিচারণের ভাষায় শ্রী অবন্তীকুমার সান্যালের মন্তব্য—'তার কর্ম ছিল তার কবিত্বের পরিপূরক। রেশনের লাইনের তিক্ত অভিসম্পাতে লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে চিৎকারে যে-ক্ষোভ যে-বেদনা যে-আশা যে-উদ্দীপনা, তাকে কেমন করে ভাষা দিতে পারা যায়? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অতি -প্রত্যক্ষ এই ক্ষোভ-বেদনা-আশা-উদ্দীপনাকে কোন তির্যক বক্রভাষণে প্রকাশ করা সম্ভব? অনুভব যেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ ভাষাকে সেখানে অবশ্যই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ হতে হবে। সহকর্মী কবিদের মধ্যে অন্য কারুরই সুকান্তর মতো এমন আক্ষরিকভাবে নগ্ন রুক্ষ বাস্তবের মুখোমুখি হবার দুর্ভাগ্য (?) হয়নি।'

মন্বন্তরের ছবি অরুণ মিত্রের 'জঠর' কবিতায়—

প্রাচীন বণিক ফেরে অন্তিম দাপটে
ঘরে ঘরে
অন্য সদাগর
সশস্ত্র তাগিদ দেয় দ্বারে ;
মাঝখানে ছিনিমিনি অন্ন গেল উড়ে
উপোসী গ্রাসের আগে।

বিষ্ণু দে-র 'চালের কাতারে' কবিতায়—

ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনিনহীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধায় নির্বোধ
ভিখারি, দেশের লোক আমাদেরই।

বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রাবণ' কবিতার একটি চরণে—

এবার শ্রাবণে দেখি বুভুক্ষায় করাল রাক্ষস

'ফ্যান' কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে—

রক্ত নয় মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎ ভাই চায় শুধু ফ্যান ;

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'আমাদের গান'-এ—

মৃত্যুর ফসলে ভরে কালের ভাণ্ডার।
ছিন্ন শির, পিষ্ট দেহ, ধূলিসাৎ অট্টালিকা, আর
মৃত-মাতা শিশুদের ক্ষুদ্র শীর্ণ মুঠি,
মৃত বৎসা মাতার ভ্রূকুটি।

দিনেশ দাসের 'মন্বন্তর' রচনায়—

বন্যার হাওয়ার মতো হা হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে—
তবু এরা আসে
এগারোশো ছিয়াত্তরে—তেরশো পঞ্চাশে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' কবিতায়—

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।

*　　　　*　　　　*

রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোনে।

তেরোশো পঞ্চাশের ভয়াল পরিবেশে বসে এমন সব দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকা হয়ে যায় কবিদের হাতে। সুকান্তর সম্পাদনায় 'আকাল' সংকলনের কবিতাগুলিতে এখনো বুঝি সেই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রত্যক্ষতার ঘ্রাণ মেলে।

এমন প্রত্যক্ষতার ঘ্রাণ মেশানো কবিতাগুলির পরিবেশে সুকান্ত, তার 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কর্মের ব্যক্ততা থেকে সরে এসে যেন বা ধ্যানীর ভাষায় ও সত্যকে জানার প্রত্যয়ে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করে যুগ-কবিদলের অমোঘ নেতৃত্বের নির্দেশ—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-মন্বন্তরের প্রসঙ্গে মৃত্যু-প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে দেখা দেবেই। কিন্তু সুকান্ত মৃত্যু নিয়ে কোন উচ্চ দার্শনিক ভাবনায় ডুব দেয়নি। মৃত্যুকে তরতাজা সামনে ধরে বা পাশে রেখে দুর্ভিক্ষের কথা বলে, দুর্ভিক্ষ থেকে বড় মানবতার উত্তরণের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের সত্য স্বপ্নের শপথ ঘোষণা করে।

বোধন, বিবৃতি, শত্রু এক, ফসলের ডাক—এমন একাধিক কবিতায় সুকান্ত চমৎকার স্বাক্ষর রেখেছে মন্বন্তরের, মৃত্যুর অসহায়তার। কবিতাগুলি যেমন কালের দলিল, তেমনি কবির দুর্ভিক্ষের সংগে জড়িত গভীর অনুভূতি ও মানুষের সংগে অকৃত্রিম মমত্ববোধের দলিলও।

মূলত মন্বন্তর সম্পর্কেই 'বোধন' একটি দীর্ঘ-কবিতা এবং কবি সুকান্তর সবচেয়ে আন্তরিক দুর্ভিক্ষের কবিতা।

কবিতার প্রথমেই কবির সম্বোধন 'মহামানব'-কে—রবীন্দ্রনাথের 'মহামানব' শব্দ-প্রয়োগ-ভাবনা এখানে কবি-মনে সক্রিয় হলেও, কিশোর কবির মুখ সম্পূর্ণ অন্যদিকে ফেরানো। 'বিসর্জন' নাটকে কৃত্রিমভাবে রঘুপতির প্রতিমার মূর্তি ঘুরিয়ে মুখ ফেরানোর মত।

'হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোক চক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।

এর পরেই কবির স্মরণে আসে মারী, মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যা, চরম দুঃখ, ভাঙা ঘর, নির্জন ফাঁকা ভিটের কথা, লোভের কথা, শূন্য মাঠে কঙ্কাল করোটির বিদ্রূপ, হাতছানির কথা। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে—

তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।

'বোধন' কবিতার অন্তর্নিহিত উদ্দীপন বিভাব হল কবির স্ব-কালের বীভৎস মন্বন্তর। স্থায়ীভাব কবির অন্তর-নিহিত মানবতাবোধ।

কবিতার মধ্য-অংশে কবির কণ্ঠ পরিবর্তিত, সেই সংগে কণ্ঠস্বরের লক্ষ্যবস্তুরও বদল। সে বস্তু ঘৃণ্য মালিকপক্ষ, স্বার্থপর অর্থগৃধ্নু মজুতদারের দল। 'মালিক' ও 'মজুতদার'—এই শব্দ দু'টির অনুষঙ্গেই যেন সুকান্তর কবি মনে ক্রোধজনিত বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সঙ্গে কবির অমোঘ তর্জনী শাসন।

শোন্-রে মালিক, শোন্-রে মজুতদার।
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?

পরমুহূর্তে ক্রোধের মধ্য থেকেই হাহাকার মেশানো শাসন-কণ্ঠ, তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা কালো ভারি মেঘে বজ্রের মত শব্দময় হয়—

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি?

এমন কাব্যানুভূতি সমন্বিত স্বগতোক্তির সংলাপ রচনায় প্রমাণ হয়ে যায় সুকান্তর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—'আমি দুর্ভিক্ষের কবি।'

'বোধন' কবিতায় কবির উত্তেজনা, ক্রোধ, বিদ্রোহভাবনা, ধিক্কার-ভাষা কবির মানবিক বোধের কোন তল থেকে যে দেখা দিয়েছে, তা সহজে স্পর্শ করা যায় না। সেখানে কিশোর কবি একা এবং একাই স্বয়ং-নায়ক। তাই স্বয়ং ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে সবল পৌরুষে

দৃঢ়চিত্ত হয়ে একেবারে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু চীৎকারে কণ্ঠ তোলে—

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্‌রে মজুতদার,—
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

কবি সুকান্ত যেনবা নিজেই 'বহু শত-যুগ পরে ভবিষ্যতের কোন যাদুঘরে' নৃতত্ত্ববিদ হয়ে প্রশান্ত অথচ রুক্ষ, বিজয়ীর মুখের হাসি মাখানো ভাবের প্রকাশের মধ্যে বলে ওঠে—

মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার—
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।

কবিতার শেষে সুকান্ত মহামানবের কাছে, চিরকালের প্রবাহিত জীবন, যুগসন্ধিকালের চেতনার কাছে 'দুর্দমনীয় শক্তি' ভিক্ষা করেছে, 'অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী'কে মুছে ফেলে শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে মানুষের সংহতিকে একত্রিত করার সুতীব্র বাসনা জানিয়েছে।

আর 'তা যদি না হয়',—
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারত বটে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, মন্বন্তর ও মৃত্যু স্মরণে এমন সার্থক আবেগদীপ্ত রসঘন কবিতা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। কবির স্বদেশকে ভালবাসার সঙ্গে মানুষকে ভালবাসার এমন উজ্জ্বল নিদর্শন বিরল।

মন্বন্তরের ওপর সুকান্তর আর একটি বিখ্যাত কবিতা—'বিবৃতি'। কবিতাটির প্রথম পাঁচটি স্তবকে যেন তেরোশো পঞ্চাশ সালের

বাংলাদেশের নিপুণ জীবন্ত ছবি। শেষ তিন স্তবকে সেই রক্তাক্ত বিবর্ণ ছবির বিশাল পটভূমি পিছনে সরিয়ে কবি স্বয়ং সামনে দণ্ডায়মান।

'বিবৃতি' কবিতার প্রথমাংশে সংবাদসূত্রে মন্বন্তরের কবিতার সার্থক রূপ, শেষাংশে কর্মী নয়, বড় কবির অনুভবে ধরা বিদ্রোহ, বিপ্লব, শপথের নির্যাস নতুন জীবন বন্দনা।

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত-মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

এমন আরম্ভের পর দুর্ভিক্ষের চিত্র চলচ্চিত্রের পর্দায় উজ্জ্বল আলোর মত সরে সরে যায়। পাঠকের সামনে একে একে আসে আহার্যের অন্বেষণে রাস্তায় মানুষের ভিড়, 'পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা', 'দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,' 'রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে'। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের কবিতা রচনায় সুকান্ত যে কত বড়, অন্তরঙ্গ, বাস্তব রসের কবি, 'বিবৃতি' কবিতার প্রথমভাগ তার প্রমাণ।

সুকান্তর অভিজ্ঞতার প্রত্যয় সিদ্ধ ও ঋদ্ধ স্বাক্ষর 'বিবৃতি' কবিতা!

দুর্ভিক্ষের ছবি থাকলেই, বর্ণনা বা উল্লেখ থাকলেই দুর্ভিক্ষের কবিতা হয় না—কিশোর কবির এমন পৌরুষ-সমৃদ্ধ চিন্তা যে ছিল, প্রমাণ 'আকাল' কাব্য সংকলনের 'কথামুখ' অংশের একটি মন্তব্য—

'কেবল সেই সব কবিতাই সংকলনে বর্জন করা হয়েছে যে কবিতায় দুর্ভিক্ষ শুধু প্রাসঙ্গিক এবং যে-কবিতা সংকলয়িতার ধারণায় কবিতা হয়নি।'

দুর্ভিক্ষের কবিতা রচনায় কবিকে দুর্ভিক্ষের ভিতর থেকে উঠে আসতে হয় বড় জায়গায়—যেখানে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির দিক স্পষ্ট করে উল্লেখিত থাকবে। দুর্ভিক্ষের কবিতায় দুর্ভিক্ষের চিত্র সত্য, কিন্তু তা-ই শেষ কথা নয়। কবির মানবিকতাবোধের গভীর তাৎপর্য

সেই ভাষাচিত্রের ওপর আনবে আগামী দিনের সূর্যোদয়ের রক্তিম আকাশের আকর্ষণ।

'বিবৃতি' কবিতায় তারই সার্থক রূপায়ণ কবির দু'টি মূল্যবান চরণে—

রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

'বোধন' আর 'বিবৃতি'—দুই কবিতারই উদ্দীপন বিভাব মন্বন্তর, কিন্তু দুই রচনার বিস্তার ও সিদ্ধান্তে সুকান্তর কবিমন নূতন ভাবনায় রক্তিম, নূতন সত্যে ও পথ-পরিক্রমায় উদ্যোগী, উৎসুক।

'শত্রু এক' কবিতায় সুকান্ত দুর্ভিক্ষকে যুদ্ধের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে মানুষের শত্রুর একটি সামগ্রিক রূপ ধরতে উৎসুক।

আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।

'ফসলের ডাক' কবিতায় দুর্ভিক্ষকে মনে রেখে কাব্য-ভাবনাকে কৃষক নির্ভর জীবন সূত্রে শপথমুখী করার প্রয়াস স্পষ্ট।

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে,

এই কারণে সুকান্ত নেয় চাষীদের, চাষের রক্ষার দায়িত্ব। 'কৃষকের গান' কবিতাতেও দুর্ভিক্ষ উদ্দীপন বিভাব, কবির লক্ষ্য অন্যমুখী। 'দুর্মর' কবিতায় দুর্ভিক্ষ স্মৃতি-অনুষঙ্গে অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চারিত।

'ঐতিহাসিক' কবিতায় আছে দুর্ভিক্ষের চিত্র, কিন্তু তার লক্ষ্য কবির দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের ভাবনায় নেই আদৌ। সুকান্ত একটি স্পষ্ট চিত্র উপহার দিয়েছে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ ভাষায়—

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান—

একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন ?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।

সমগ্র কবিতায় এইটুকু মাত্র দুর্ভিক্ষের ছবি।

কিন্তু 'ঐতিহাসিক' কবিতায় সুকান্ত এই চিত্রটুকুতে করেছে উপমায় বৃহৎ এক ঐতিহাসিক বক্তব্য ও যুগসন্ধিকেই বোঝাতে।

সুকান্তর জীবনে ও মনে, কবি-স্বভাবে ও আত্মায় দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ছিল সদাজাগ্রত। কখনো তা এসেছে প্রত্যক্ষভাবে, কখনো তার সূত্রেই সুকান্ত রাখে সত্যিকারের মন্বন্তরের কবিতা পাঠকদের সামনে, কখনো তা প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র। কোথাও বা তা হয়েছে অন্য কোন মূল তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করার উপমারূপে প্রয়োগ। 'ঐতিহাসিক' কবিতায় এই শেষতম প্রয়াস।

সুকান্তর কবিতায় দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর-ভাবনা মূলত মানব্য ভাবনার নামান্তর। যেমন যুদ্ধ, তেমনি দাঙ্গা, যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভেদের ফলে সংকীর্ণতাবাদীদের সাম্যবাদ সম্পর্ক অপপ্রচার, তেমনি মন্বন্তর ও মৃত্যুদৃশ্য এবং চিন্তা সুকান্তকে সমান আগ্রহী করে তোলে সংশ্লিষ্ট কাব্যরচনায়। দুর্ভিক্ষ ভাবনা স্বতঃস্ফূর্ত কবিভাবনার আবেগ থেকে জাত। তা সহজাত। তা কালের লিখন, ললাট-লিখনও।

সুকান্তর কাব্যের আবেগ পদ্মের আসনে আসীন লক্ষ্মীর মত মনোরম, দ্যুতিময় কিরণে ধন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও প্রণত কিশোর-কবি সুকান্ত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আর কিশোর কবি সুকান্ত।

যেন যেখানে সুবিশাল সমাপ্তি সেখানেই আর এক নতুনের শুরু।

যেন পৃথিবীর মত গ্রহের চারপাশে নিঃসীম শূন্যে যেখানে মাধ্যাকর্ষণের সীমা, সেখানে চন্দ্রের মত আর এক গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্তর সাক্ষাৎকালে চিহ্নিত ছিল এমনি এক জটিল 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড।'

এক কবি পরিণত বয়স, জীবন, মন ও মননে পূর্ণসিদ্ধ, ঋদ্ধ কোবিদ্‌ কবি।

আর একজন সদ্য-অঙ্কুরিত জীবন-স্বভাবে কিশোর, যাত্রারম্ভের ঔৎসুক্যে, বিস্ময়ে, নতুন মত ও পথের দিকে উন্মুখ।

একজন জ্যেষ্ঠ, অন্যজন কনিষ্ঠ।

এক কবি পরিণত ফল, অন্য কবি বীজ থেকে কচি পাতায় সাজানো চারাগাছ—'ছোট চারাগাছ—/···বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে/···এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ/ শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল!'

রবীন্দ্রনাথের মত বৃহত্তম এক বনস্পতির পাশে যদি সুকান্তকে চারাগাছের প্রতীকে তাৎপর্য দান করা যায়, তবে সে চারাগাছে 'গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ;' 'মনে হয়,···রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের ধারায় ধারায় জন্ম' তার।

রবীন্দ্রনাথের পাশে সুকান্ত সত্যই এক 'বিদ্রোহের দূত।'

এই বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়—যা ঘটেছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুলের কাব্য-প্রয়াসে! এই বিদ্রোহ সময়ের অব্যবস্থার, অসামাজিকতার, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের, মানবতা-বিধ্বংসী সমস্তরকম প্রয়াসের বিরুদ্ধে।

সাতই আগস্ট, উনিশ শ একচল্লিশ সাল, বাংলা তেরশ আটচল্লিশ সালের বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণের দিন। তখন যুদ্ধ তার প্রবল পরাক্রমে ভারতের দ্বারদেশে সবলে আঘাত হানতে উন্মুখ।

পনের বছরের কিশোর কবি তখন রবীন্দ্রপাঠেই তৃপ্ত, প্রত্যক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গ লাভ তখন অনেক দূরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগনে ধ্রুবতারায় স্থিত, চিরনির্দিষ্ট যখন, যখন কোন কবি, গদ্য-লেখক, নাট্যকার রবীন্দ্র সূর্যকিরণ থেকে নিজেকে অন্তরালে রাখতে অসমর্থ, তখন সুকান্তর স্বরূপ কি?

সুকান্তকে সুকান্তর কাল অতি ধীরে শম্বুকগতির মত ছায়াচ্ছন্ন করে, যুদ্ধের দৃপ্ত হুংকার তার কিশোর-সুলভ মনের বিস্ময়বোধ, রোমান্টিক অনুভাবনায় মৃত্যুস্বাদী বেদনা না এনে আনে রূঢ় বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার অভিঘাত। এমন চেতনার প্রস্তুতি পর্বে রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবির কাছে কি রকম? কিশোর কবির লেখনীতে রবীন্দ্রবন্দনা, না, রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে, স্মরণ করে জীবন-প্রত্যয়ে দীপ্ত সোচ্চার শপথ-গ্রহণ?

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় দ্বিতীয় ভাবনারই নিপুণ কাব্যিক স্বীকরণ।

কিশোর কবির সবচেয়ে প্রিয়, সে সময়ের সম্পূর্ণ আরাধ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। বালক বয়সে দিদির কাছে শিক্ষা, বাড়ির পরিবেশে রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি, পাঠ সুকান্তকে দেয় গভীর মুগ্ধতা, বিস্ময় এবং এই সূত্রেই বিশ্বকবির প্রতি তার আসে তীব্রতম ভালবাসার আকর্ষণ, আসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার মত শ্রদ্ধাবোধ।

এই শিক্ষায়, মানসিক গঠনে পনেরো বছর বয়সে এক সচেতন অনুভূতিপ্রাণ কিশোর কবির রবীন্দ্র-স্মরণ কাব্যে হয় রবীন্দ্র-শরণ।

রবীন্দ্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, রবীন্দ্র ছায়ায় বুঝিবা শীতল শান্ত শান্তি লাভ করতে করতে, একসময় রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণের ব্যথায় দীর্ণ হৃদয়ে সুকান্ত লেখে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা।

কিন্তু সে কাল দুর্ভিক্ষের কাল। মানবিক মূল্যবোধের নতুন বিচারের কাল।

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতার কাব্যভাষা, কাব্য-বক্তব্য তাই নতুন হয়ে আসে।

কবির স্পষ্ট নতুন ভাষার স্বীকারোক্তি—'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি'!

এমন জ্বালা-ধরা, বেদনা-অপমানে, চারপাশের কুকুর-বিড়ালের মত মৃত্যুর কালে অধোমুখ কিশোর কবি মুখ তুলে দাঁড়াবার সাহস চায়। শক্তি ভিক্ষা করে অগ্রজ, বিশ্ববন্দিত, পরিণত বয়স ও চেতনায় ঋদ্ধ, মহাপ্রয়াণের পথে অতীত, ধূসর কবি রবীন্দ্রনাথের শরণ। রবীন্দ্র-আত্মার সু-স্বাগতম।

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।

ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের প্রতিবেশে কিশোর কবির দগ্ধ হৃদয়ে বিশ্বকবির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণ করে এক নতুন কবির প্রণাম!

পরিবেশ প্রতিকূল! তবু কবির গানে তরুণ কবির উদ্বেলতার অর্থই হল আন্তরিক স্বীকৃতি!

রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রতি কিশোর কবির কৃতজ্ঞ চিত্তে ভিক্ষা প্রার্থনা জাতীয় জীবনে সমস্ত বৈপরীত্যের মধ্যে সোনার ফসল ফলানোর আর্ত আকুলতাই। সুকান্ত দুর্দিনে বেশী করে বুকের গভীরে লালন করে চলে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টির স্পর্শকে।

এ যেন ভয়ংকর উত্তাল বন্যার পরিবেশে শক্ত সমর্থ পিতার, অসীম বাঁচার আকাঙ্ক্ষায়, বুকের গভীরে মুখ লুকিয়ে বুকের ওমে সাহস-সঞ্চয় প্রয়াস!

সুকান্তর কবি-জীবনের অভীক মন্ত্র তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই! এ ছাড়া কোথায় আশ্রয় পাবে নতুন যুগের কবিদল? কোথায় পাবে সঠিক কবিতার নির্দেশ, পাবে কবিতা রচনার শক্তভূমি?

সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত থাবা মুখ-চোখের, লোল জিহ্বার আগ্রাসনের আর্তি নিয়ে কলকাতা তথা বাংলাদেশের সামনে। কিশোর কবিমনে আছে 'হানাদারী-মৃত্যুর কবলে' পড়ে গোপন লাঞ্ছনার বিষণ্ণ ছায়া। নিত্য, অগণন, উপবাস-ক্লিষ্ট মুখ সুকান্তকে গভীর অন্ধকার রাতে এক অজ্ঞাত সরীসৃপের বিচরণশীল স্পষ্ট শ্বাসের মত আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

ঠিক এই সময়ে কে তাকে প্রত্যয়ে রক্তিম করার ক্ষমতা রাখে? কে সে?

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, রাজনীতির জটিল-যৌগিক স্রোত, মুনাফাবাজদের রাতের অন্ধকারের ক্রিয়াকলাপ, সমস্ত কিছুর মূলে মানবতাকে বিনাশ করার গভীর ষড়যন্ত্র—এসবের মধ্যে একটি নাম উচ্চারণ, একটি স্মৃতিচারণই বাঁচার সাহস দেয়।

সে নাম রবীন্দ্রনাথ! 'এ কম্প্লিট ম্যান!'

সে নামোচ্চারণ যেনবা মুমূর্ষু মানুষের মন্ত্রোচ্চারণ!

সে স্মৃতিচারণ তো রবীন্দ্রস্মরণ থেকে রবীন্দ্রশরণেরই একমাত্র উপায়!

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় উপসংহারে কবির লক্ষ্য স্পষ্ট, কবির শ্রাবণ সন্ধ্যার স্মরণবাণীর যথার্থ স্বীকৃতি।

> তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
> "শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'
> তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
> দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

সিদ্ধান্তের মধ্যে সুকান্ত রবীন্দ্র-সৃষ্ট একটি চরণ যেন বা ধুয়ার মত প্রয়োগ করে রাখে। শান্তির বাণী এক ব্যর্থ পরিহাস ঠিকই, সংগে সংগে চণ্ড যুদ্ধ ও তার 'উপজাত'গুলির সংগে সংগ্রামী জনচেতনার, কবির অকৃত্রিম বিশ্বাসের যে মোকাবিলা—তা যে প্রতিজ্ঞা-দীপ্ত, তা যে প্রতিটি ঘরের গোপন বার্তা!

আমাদের বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা দিয়েই সুকান্ত গুরু প্রণাম সমাপ্ত করে এবং এই প্রণাম-মন্ত্রের মধ্যে আছে নতুন বাস্তবতার, প্রত্যক্ষতার পরম জন্মযন্ত্রণা।

তার স্রষ্টা কবি সুকান্ত, সৃষ্টির রূপ কি হবে তার পরিচয় পরবর্তী সৃষ্টির ধারা থেকেই জন্ম নেবে।

'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় আর ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্র-বরণ নেই, তার থেকেও বেশী এক জন্মদিন ও জন্মক্ষণকে স্মরণ—যা মহাকালের ধারায় ও সূত্রে একটি উজ্জ্বল চিহ্ন।

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।

স্পষ্ট বোধগম্য হয়, পঁচিশে বৈশাখ সমস্ত গণনার অতীত একটি দিন—যেখানে লক্ষ লক্ষ রবীন্দ্রনাথের পুনর্জন্মের প্রতীক্ষা।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় যা ছিল স্বীকৃতি, 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় তা হয়েছে সকরুণ মিনতি!

তাই স্মৃতি-অনুষঙ্গে শুধু উজ্জ্বল উপস্থিতিতে কিশোর কবির আত্মগৌরব নেই, চাই প্রত্যক্ষ শক্তি!

'হতাশায় স্তব্ধ বাক্য ; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,'

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় যে ছিল 'আমি', এখানে সে হয়েছে 'আমরা'।

ব্যক্তি হয়েছে বিশ্ব।

একজন হয়েছে বহুজন।

তরুণ কবির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক শাল বৃক্ষের মত ঋজু দীর্ঘ, সবল, ঊর্ধ্বমুখী সাহস! সমগ্রজাতির ভাষা, 'হতাশায় স্তব্ধ বাক্য' মানুষের প্রাণের ভাষা, 'রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্যম সুদীর্ঘ মৌনতা'-ভঙ্গের ভাষা! 'পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত' হবার মত কণ্ঠ দেওয়ার এক অধিকারী তো রবীন্দ্রনাথ :

তরুণ কবির রবীন্দ্র-প্রীতি, হৃদয়ের শব্দের সংগে রবীন্দ্রনাথ নামের অনুরণন রচনা তো এই কবিতায় বিশ্বজনীনতায় ধরা!

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় আছে অতীত রবীন্দ্রর স্মরণ, 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় আছে অনাগত রবীন্দ্র-অভিনন্দন।

অনাগতের রবীন্দ্রনাথ তো একক নয়!

কাল ও মহাকালের যৌথরথচক্রে যতগুলি পঁচিশে বৈশাখ জন্ম দিয়ে যাবে, যতদিন যতবার তার আবর্তনে আসা-যাওয়া ঘটবে, ততবারই নিত্য রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়ে যাবে। কিশোর কবি সেই রবীন্দ্রনাথকে দিব্য চক্ষে বলে ওঠে—

অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ :
দস্যুতায় দৃপ্তকণ্ঠ (বিগতদিনের)
ধৈর্যের বাঁধন যার ভাঙে দুঃশাসনের আঘাত,
যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।

অতীতের মধ্য দিয়েই অনাগত রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটবে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের যে সত্য-উপলব্ধি, তা নির্ভুল অঙ্কের মত। এক কোবিদ কবি, ঋষি কবির আত্মিক অগ্রগমনের ফলশ্রুতির কথা ভেবেই কিশোর কবির আত্মবিশ্বাস—

তাঁর জন্ম অনিবার্য, তাঁকে ফিরে পাবই আবার।

যুদ্ধ যখন রক্তচক্ষু নিয়ে সমকালে চলমান, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন এক রূপ। যখন শেষ, তখন সেই রূপের রূপান্তর। আর এক রূপে তার স্বীকরণ!

রামরাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারতজটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।

* * *

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ সংগীতের সুর;

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' আর 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতা দু'টির ওপর কিশোর কবি সুকান্তের যেনবা দুই পা রেখে সবলে এগিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত প্রয়াস।

প্রথম কবিতায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ সমকালের প্রেক্ষিত, দ্বিতীয় কবিতায় যুদ্ধ-শেষের প্রেক্ষিত। প্রথম কবিতায় কিশোর কবির যে পা রাখা, দ্বিতীয় কবিতা সেই পায়ের নতুন করে চলা।

প্রথম কবিতায় সব সময়েই কবি 'আমি', দ্বিতীয় কবিতায় কবি 'আমি' থেকে 'আমরা'।

কারণ, যে অনাগত রবীন্দ্র ঠাকুরের 'বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর'-এর কল্পনা কিশোর কবি-আত্মায়, তা যেন তরুণ কবিরই বাঞ্ছিত প্রতিরূপ। অগণন পঁচিশে বৈশাখ যে অগণন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসবে, তারা তো 'জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে।'

তার মধ্যে কবি সুকান্তও অন্যতম এক যাত্রী।

'প্রথম বার্ষিকী' কবিতায় রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শব্দ, ছন্দ, সুর, ধ্বনিময়-তাকে লেখনীর শীর্ষে মসীর মত সম্পৃক্ত করে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে করে স্বাগত। রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতার চরণরীতি, স্তবক বন্ধ, মিশ্রবৃত্ত তথা মুক্তক ছন্দের তথা গদ্যাভাস-সমন্বিত ছন্দরীতির আবহে এ কবিতায় একটি বিষণ্ণ প্রতিবেশ চোখে পড়ে।

তোমার ধূসর স্মৃতি, তোমার কাব্যের সুরভিতে
লেগেছে সন্ধ্যার ছোঁওয়া, প্রাণ ভরে দিতে
হেমন্তের শিশিরের কণা
আমি পারিব না।

'প্রথম বার্ষিকী'-তে যে কবি-স্মৃতির রোমান্টিক রূপ, তা বিষণ্ণ ছায়া-মাখা। কারণ সেই এক—সভ্য পৃথিবীর অসভ্য পরিবেশ। সুকান্তর স্পর্শকাতর মনে সেই অনুষঙ্গই বার বার তরুণ কবিকে বিরক্ত করে, শান্তির আশায় জ্যেষ্ঠ কবিকে মনের মণিকোঠায় নিয়ে আসে।

সেখান থেকেই জন্ম নেয় 'প্রথম বার্ষিকী' কবিতা।

বুঝিবা জ্যেষ্ঠ কবির কাছে, কবি-আত্মার অশরীর অলৌকিক দরবারে কনিষ্ঠ কবির অভিযোগ জ্ঞাপন।

'প্রথম বার্ষিকী' কবিতার সুরে, ভাষায়, আমেজে যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর ব্যবস্থা।

সারা কবিতা ধরে এমন বিধুর স্মৃতি-অনুষঙ্গ কেন? কেন একাধিক স্মৃতি সূত্রে আশঙ্কা, ভয়, জিজ্ঞাসার প্রকাশ? কেন এমন আকুল সংশয়ে দীপ্ত বিষণ্ণ প্রতিবেদন—

তোমার সন্ধ্যার ছায়া খানি
কোন পথ হতে মোরে

'কোন পথে নিয়ে যাবে টানি'
অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী
আমি নাহি জানি।

কারণ সেই রবীন্দ্র প্রীতি হ'ল সেই সময়ের অভিশাপ, বিষাক্ত শ্বাস, সর্বমানুষের জ্বালাধরা পরিবেশের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কবির সান্নিধ্যে কিছুকাল শান্তিতে থাকার বাসনা!

সারাদিনের সমস্ত কষ্টের শেষে, সমস্ত অবজ্ঞা, উৎপীড়ন, অবহেলা, তাচ্ছিল্য, হতাশা, বেদনা, অসহায়তা থেকে একটু শান্তির জন্যে যেমন দুরন্ত পুত্রও চায় পিতার বুকে আশ্রয়, যে আশ্রয় নির্ভরতার—ঠিক তেমনি বুঝি কবি সুকান্তর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মরণ সূত্রে একটু শান্তির অভীপ্সা।

'প্রথম বার্ষিকী' কবিতাতেও সুকান্ত ভোলেনি তার সময়কে। কাল তার কাছে রাক্ষসের মত, দৈত্যের মত, সদা ভয়-প্রদানকারী বিদেহী অতৃপ্ত আত্মার মত। কবিতার উপসংহার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে তেমনি—আতঙ্কিত অনুভবেই—

এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়।

'প্রথম বার্ষিকী' কবিতা বস্তুত সুকান্তর রবীন্দ্র-প্রণাম নয়, রবীন্দ্র স্মরণ; রবীন্দ্র গীতি নয়, রবীন্দ্র প্রীতি!

একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবার জন্যেই সুকান্ত লেখে 'সূর্য-প্রণাম' নামে গীতি-নাট্য।

'সূর্য-প্রণাম'-এর 'অস্তাচল' অংশের প্রথম কবিতা 'প্রান্তিক' পাঠান্তরে ছিল 'পঁচিশে-বৈশাখ।' রচনাটি প্রথম উপহার হিসেবে দেয়

ভাই ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। পরে নিজেই 'সূর্য-প্রণাম' গীতিনাট্যে যোগ করে।

রবীন্দ্র প্রভাব এ কবিতায় নামাবলীর মত। এখানেও সেই গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো।

বেলাশেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে,
তারি মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক।

এই 'বিভ্রান্ত পথিক' কে?

যেন মনে হয়, তরুণ কবি স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বার বার কিশোর কবির এ যেন আশ্রয় অনুসন্ধানের আর এক আচম্বিত প্রয়াস!

'সূর্য-প্রণাম'-এর 'অস্তাচল' অংশের আর একটি কবিতা 'যাত্রা'।

এ কবিতার কিশোর কবি রবীন্দ্র প্রভাবকে মাথার মুকুট করে। সেই মুকুটেই নিজ কবি-আত্মার প্রতিবিম্ব দেখে। কবির বাসনার অর্ঘ্য যেন বিষণ্ণ কবি প্রাণের মৃত্যুজনিত স্মরণ-ভাষ্য—

অমৃত লোকের যাত্রা হে অমর কবি, কোন্ প্রস্থানের
পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
নিজেরে করেছ মুক্ত, বিদায়ের নিত্য আশঙ্কায়
পৃথিবীর বন্ধন ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করিতে বিপুল প্রয়াস
তব দিনে দিনে হয়েছে বর্ধিত।

এখানকার শব্দ, শব্দ-ধ্বনি, ছন্দ-স্পন্দ, চরণের দৈর্ঘ, চিন্তার প্রসারিত চলন—সবই রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেই। কিন্তু এক কিশোর কবির অন্তরঙ্গ অনুভব এখানে মমতায় স্নিগ্ধ, গভীর রস-সঞ্চারী।

'যাত্রা' কবিতার মধ্য-অংশে এসে দেখি কিশোর কবির চোখে যেন আত্মীয় মৃত্যু-দর্শনে উন্মাদ হওয়ার ভাষা! কবির চিন্তা থেকে যে আগুন আর ধূমের ক্রমাগত উদগীরণ, তা কিশোর কবিকে জগত-পরিহাসের অন্যতম দিক যে মায়া প্রপঞ্চময়তা—তাকেই স্পষ্ট করে দেয়।

কিশোর কবির চোখে জল।

কবি সুকান্তর অন্তরের অন্তর্লীন প্রদেশে ভয়ংকর এক বিরহ-বিধুর দাহ, সব হারানোর অসীম শূন্যতা। এমন অকৃত্রিম, অন্তরঙ্গ, নিঃসঙ্গ, একান্ত নিজস্ব শূন্যতাবোধ তৈরী হয়েছে বলেই পাঁচটি অবিস্মরণীয় দুঃখার্তির জীবন্ত বাঙ্ময়, চিত্রল চরণ পেয়ে যাই কবিতার শেষের দিকে—

সেই তুমি আজ পথে পথে,
প্রয়াণের অস্পষ্ট পরিহাসে আমাদের করেছ
উন্মাদ। চেয়ে দেখি চিতা তব জ্বলে যায় অসহ্য
দাহনে, জ্বলে যায় ধীরে ধীরে প্রত্যেক অন্তর।

একা কিশোর কবির দুঃখ-যন্ত্রণা, কিন্তু সমবেত মানুষের দুঃখের সংগে তা সমান বাঁধা তারে সূত্রবদ্ধ হয়ে যায়, যখন কবি বলে ওঠে 'প্রত্যেক অন্তরে'-র জ্বলে ওঠার কথা।

বিশ্বকবির মৃত্যুতে কবি সুকান্ত গভীর শোকাহত, বিমূঢ়, সম্ভবত অসহায়ও। আর সেই কারণেই সুকান্তর অবাক বিস্ময়ে একটিই জিজ্ঞাসা এবং তা-ই হ'য়ে ওঠে 'যাত্রা' কবিতার শেষতম চরণে অসীম অন্বেষার স্বাক্ষর।

তুমি যে বিরাট, অভিনব
সবারে কাঁদায়ে যাও চুপি চুপি একী লীলা তব॥

'যাত্রা' কবিতা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন স্মরণে কবি সুকান্তর মূল্যবান শ্রদ্ধার্ঘ। এখানেও জ্যেষ্ঠ কবির কাছে কনিষ্ঠ কবির একনিষ্ঠ আত্ম-বিতরণ।

কিন্তু ক্রমে সুকান্তর কবিতার আবেগ, ভাব, ভাষা হয় ভিন্নমুখী—সমুদ্র থেকে স্বতন্ত্র এক নদীর স্বভাবের মত।

রবীন্দ্রনাথ 'এ কম্প্লিট ম্যান'।

কবি গয়টের সম্বর্ধনার উত্তরে জার্মান কবির প্রতি সম্রাট নেপোলিয়নের এরকমই ছিল শ্রদ্ধা-নিবেদিত ভাষা! এমনি উপহার।

কিন্তু, মাত্র একুশ বছরের সুকান্ত?

ষষ্ঠ অধ্যায়

শোষিত, সর্বহারা শ্রেণী ও কবি সুকান্ত

জীবন সদা চঞ্চল। আর এই সদা-চঞ্চল, যৌবন-স্বভাবে দীপ্ত জীবনের অন্যতম সঙ্গী সমাজ।

সমাজের এক নাম কঠিন একতা।

সমাজের একমাত্র আশ্রয়—মানবতা, লক্ষ্য—অন্তহীন মানব প্রাণের সমবেত শক্তির স্ফুরণ, লালন, অগ্রগমনে সহায়তা করা।

ইতিহাসের হাত ধরে যুগ, কাল, সভ্যতা এই সমাজের বুকে নিজ নিজ ললাট-লিখন পড়ে চলে।

সময় সমাজের নিয়ন্ত্রক, আবার সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগমনে প্রয়োজনীয় সচল রথচক্রও।

জীবন, ইতিহাস, সময়, মানবের সমবেত চেতনা—এসবের মূলে ধীর, স্থির থাকে মানবতা। অনন্তকাল ধরে এই মানবতাই প্রয়োজনে যেমন জীবনকে করে চঞ্চল, ইতিহাসকে দেয় রক্তাক্ত স্বাক্ষর রাখার নির্দেশ, সময়কে করে দীপিত, সমাজকে তেমনি দেয় তার বয়স বৃদ্ধির, অভিজ্ঞতা তৈরীর ক্ষেত্র।

পরিবর্তনশীলতাই সমাজের যৌবন। তার যৌবন-প্রাণের কেন্দ্রীয় শক্তি চিরকালের মানব-ভাবনা—মানব্য।

কবি সুকান্তর কবিতায় সমাজের এক নতুন পরিবর্তনের অধ্যায় চিহ্নিত। সারা বিশ্বে একাধিক রাষ্ট্রশক্তির বদল, রাজনীতি অর্থনীতির নতুন ব্যাখ্যা, মানব-বুদ্ধির নব নব উন্মেষ আর বিজ্ঞান-বিকাশের ও বৈজ্ঞানিক চেতনার অভিনব অধ্যায়ে সমাজ নতুন পোষাক গ্রহণ করতে উৎসুক।

সুকান্তর কালে নতুন এক সমাজের জন্ম-যন্ত্রণা। এক পুরনো সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই তার জন্মের আর্তকণ্ঠ। সেই পুরনো সমাজ ধনতন্ত্রের, পুঁজিবাদের।

সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস—এই দুয়ের সমান অগ্রগতিতে একদা দেখা দেয় সমাজ—মানুষের গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত দ্বিধাবিভক্তি—সেই সূত্রে আসে সমাজের দুই মেরু-অভিমুখী রূপাবয়ব।

একদিকে শাসক-শোষক। আর একদিকে অত্যাচারিত, শোষিত সর্বহারা।

একদিকে পুঁজিবাদকে আশ্রয় করে ধনতন্ত্রের দম্ভ ও অহংকার, আর একদিকে সর্বহারা শ্রেণীর নতুন সমাজ ভাবনার স্বপ্ন।

কবি সুকান্তর কাব্য রচনার কালে স্পষ্ট হয়ে যায় সমাজের দুই রূপ—ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজ। কিন্তু এক একটি যুদ্ধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকাশ ঘটে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই।

বুঝিরা ঈশ্বরের অলক্ষ্য বিধান—ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস থেকে তার মুক্তি আর নয়, চাই সর্বহারা মানুষের সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিবাদী, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার তৈরী-করা যুদ্ধ। ওই যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় চণ্ড ফ্যাসিবাদে। ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য চিরকালের শোষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিপ্লব চেতনা, প্রতিবাদী কণ্ঠ, অগ্নিগর্ভ উজ্জ্বল বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে সবলে পদদলিত করা, সমূলে নির্মূল করা।

তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, হিটলারী রাক্ষস-সুলভ মুখ-ব্যাদানে একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাশিয়া—নব সমাজ-চেতনা; সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ মার্কস্-এঙ্গেল্স্-লেনিনের রাশিয়ার ধ্বংসস্তূপ রচনা-করা।

ইতিহাস বড় নির্মম। সর্বহারার দল বড় শক্তিবান। মানবতা দধীচির হাড়ের মত কঠিন বস্তু দিয়ে রচিত হওয়া এক শক্তি—এক অনন্ত জীবন-সত্য। নতুন সমাজ চেতনা যেহেতু এসবের চমৎকার এক ক্ষেত্রফল, তাই দ্বিতীয় যুদ্ধেই ক্রমশ রচিত হতে থাকে পুঁজিবাদ তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নির্জন, পরিত্যক্ত, মানুষের উচ্ছিষ্টের মত ঘৃণ্য কবর স্থান।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের সংকেত, আর একদিকে শোষিত জনগণের কলকণ্ঠের দূরাগত স্পষ্ট উতরোল—সমাজ চেতনার এমন সন্ধিক্ষণেই কবি সুকান্তর লেখনী হয়ে ওঠে গতিপ্রাণ।

সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে সুকান্ত সভ্য হয় কমিউনিস্ট পার্টির, তার আগে থেকেই সে ছিল দেশীয় সর্বহারাদের পাশে। তাদের জন্য তার রক্তিম দুই চোখের জমিতে অশ্রু।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার একবছরের মধ্যেই সুকান্তর লেখা 'অনুভব' কবিতা। উনিশ শ' চল্লিশ সালেই—মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের কবির লেখনীতে অতি সরল কণ্ঠের ধ্বনি দেখা যায়—

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি।
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।

এক কিশোরের স্বদেশবাসের অভিজ্ঞতার স্বরূপ কি?

দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।

* * *

হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমায় সেলাম।

কবির কাকে এমন ব্যঙ্গোক্তি-চিহ্নিত সেলাম জানানো?

তখনো কিশোরের সামনে ধরা পড়েনি সাম্যবাদী দুনিয়ার জীবন্ত মানব প্রাণের ছবি, উল্লাস। অতি সহজ, সরল কণ্ঠেই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার আশ্রিত, বৃটিশ-শাসিত ভারতকেই সে সত্য-চিত্রের আশ্রয় ভাবে। তাই তার ক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেই!

এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরুদ্ধ চেতনাই ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক রূপ পায় উনিশ শ' একচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সালের মৃত্যু-পূর্বকাল পর্যন্ত রচিত কবিতায়।

শোষিত ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর হয়ে সর্বকালের মানুষের কথা ভেবেই কিশোর কবির আন্তর শপথ—

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।

আর এই শপথ গ্রহণের মূলে তার কিশোর প্রাণের যেনবা 'রেজারেকশান্'—

পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—।

এই আসন্ন যুগ হল সাম্যবাদী চিন্তাধারায়, সর্বহারাদের জন্য, চিরকালের শোষিতদের জন্য মুক্তি-প্রত্যয়ে ও দৃঢ় ভাবনায় চিহ্নিত সমাজতন্ত্র।

বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত সভ্য নয় তখন সুকান্ত, তখন থেকেই কিন্তু সে নিরলস কর্মী। ক্রমশ কর্মের মধ্যে ডুবে গিয়ে, গভীর বেদনা-সিক্ত অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়ে টলস্টয়ের নায়ক নেখ্লুদভের মত রেজারেকশান্ ঘটে কর্মী সুকান্তর কর্মের নির্যাসে। সুকান্ত হয় সাচ্চা কমিউনিস্ট।

কিন্তু আগে কবি, আগে মানবপ্রেমিক কর্মী, জীবন-উৎসর্গীকৃত, পরে কমিউনিস্ট, সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

তাই সুকান্তর কবিতায় সমাজ-চেতনা তথা সাম্যবাদী সমাজভাবনা দেখা দেয় কবির অনুভূতির মধ্য দিয়েই। ত্রিকালদর্শী কবি মানব্যের রাজদণ্ড হাতে কাব্যের অন্তরঙ্গ অনুভবের মধ্যে নব সমাজভাবনার নির্দেশ দিয়ে যায়।

সে নির্দেশ মার্ক্সবাদী শ্রেণী চেতনার সংগে গভীর সম্পৃক্ত। বোধন, অনুভব, পৃথিবীর দিকে তাকাও, শত্রু এক—এমন একাধিক কবিতা যেমন রাজনৈতিক কবির কলমে উপস্থাপিত, তেমনি আবার তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বক্রোক্তির আশ্রয়ে চমৎকার কাব্যিক ব্যঞ্জনাগর্ভ শিল্পরূপ দেখা দেয় রানার, সিগারেট, সিঁড়ি, চিল, কলম, একটি মোরগের কাহিনী, চারাগাছ ইত্যাদি কবিতায়।

'বোধন' কবিতায় সুকান্ত সাম্রাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্বভাবের সুনিপুণ রূপকার—

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মালিক শ্রেণীর, মজুতদার-মুনাফাখোরের, কালোবাজারী ও দালালশ্রেণীর জন্মদাতা ও লালন কর্তা। তাদের সমবেত জয়োল্লাস হিসাবহীন মৃত মানুষের হাড় স্তূপীকৃত করার মধ্যে। স্বজন-হারানো শ্মশান রচনাতেই তাদের সার্বিক কৃতিত্ব, প্রেমিকের কাছ থেকে প্রিয়ার হৃদয়-বিদীর্ণ বিচ্ছিন্নতা রচনাতেই তাদের যাবতীয় তৎপরতা।

এমন সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে কিশোর কবির বিদ্রোহাত্মক সিদ্ধান্ত—

লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো।

সেই সংগে কবির সাম্যবাদী চেতনার, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গঠন করার শপথ হয় সোচ্চার—

শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

'অনুভব ॥ ১৯৪০ ॥' কবিতায় সেই শোষক শ্রেণী সম্পর্কে সাহসদীপ্ত জ্ঞানচেতন উক্তি—

আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;

'পৃথিবীর দিকে তাকাও' কবিতায় শ্লেষোক্তি—

মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলেছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।

'মোটা প্রভুটি' হল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি।

এমন অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত, অসহায়, পিষ্ট, শোষিত মজুর শ্রেণীর কথা মনে হতেই কবি কবিতার শেষ দিকে মহান রাশিয়ার কথা আনে।

এই রাশিয়া লেনিনের গড়া, এই রাশিয়া 'গোলামির দিন শেষ'-এর রাশিয়া, এই রাশিয়া যেখানে 'মজুরের আজ জয়।'

কবি সুকান্ত রাশিয়াকে ভাবে তার স্বপ্নের, জীবনস্বপ্নের একমাত্র আশা-ভরসা। কবির স্থির বিশ্বাস—

রাশিয়া, যেখানে ন্যায়ের রাজ্য স্থায়ী,
নিষ্ঠুর 'জার' যেই দেশে ধরাশায়ী,
সোভিয়েট—'তারা' যেখানে দিচ্ছে আলো,
প্রিয়তম সেই মজুরের দেশ ভাল।

স্পষ্ট বোঝা যায় কবির আকাঙ্ক্ষিত সমাজভাবনা কোন্ বিশ্বাসে দীপিত।

'শত্রু এক' কবিতায় রাজনীতি চেতনায় উদ্দীপ্ত, উৎসাহী, আবেগ-প্রাণ কবি সত্তার যে প্রকাশ, তার মধ্যে আছে একই সংগে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর—দুই মেরুগামী রূপের বিন্যন। একদিকে সর্বহারা শ্রেণীর, কবির পক্ষে মিত্রের দল, আর একদিকে আছে শোষক শত্রুর প্রতিপক্ষ—

আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাতে আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।

যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা হতে চায় কবি, তার ব্যঞ্জনাগর্ভ স্বীকৃতি এমন উক্তির মধ্যে নিহিত।

কিশোর কবির কাছে কমরেড লেনিন এক মহত্তম সমাজবাদের, সাম্যবাদী সমাজ সংস্থাপনের প্রতীক-প্রতিম মানুষ।

বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

স্পষ্টতই এখানে ধনতন্ত্রবাদী সমাজের মুমূর্ষু অবস্থার চিত্র। লেনিন এক প্রাণশক্তি—যে মহাকালের রথচক্রের মত অমোঘ। মানবতার মত ধ্রুবতারা যার ললাটের তৃতীয় নয়ন।

লেনিন যেন বা সেই প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ়, স্থিতধী শিব যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষৎকে বুকের ওপর ত্রিবলীচিহ্নিত করে ধ্যানে বসে একদিকে সংহারের রথচক্র চালনা করেন, অন্যদিকে সৃষ্টির সবুজ সংকেত রাখেন ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যেও।

'লেনিন' কবিতার অন্তিম চরণ—

বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

এমন পৃথিবীময় বিস্তৃত 'অযুত লেনিনে'র কল্পনায় অন্যতম এক কিশোর কবি সুকান্ত দেখে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিশ্চিত মরণের ছায়া—

সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখে মুখে নিশ্চিত মরণ।

'লেনিন' কবিতায় সুকান্ত প্রমাণ করে সে মানবতাকে সামনে রেখে কোন্ শিবিরের শক্তিবৃদ্ধিতে উৎসাহী, কোন্ বিশ্বাসে সে সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে যায় নিত্য।

অন্যদিকে প্রতীকী-কবিতার আশ্রয়ে সুকান্তর যে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ব্যাখ্যা, তা কাব্যিক শ্লেষাত্মক ভাষায় অনুপম।

'রানার' কবিতায় নতুন সমাজ গড়ার ইঙ্গিত আছে পত্রের প্রতীক প্রয়োগের মধ্যে—

শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',

এক গ্রাম্য রানারকে লক্ষ্য করে কবির এই যে নির্দেশ দান, স্বভাবী পাঠকদের কাছে এই যে নব 'প্রভাত' আসার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ, আসলে তা যেন আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়ার জন্য স্বস্তি-বচন।

'সিগারেট' কবিতায় স্পষ্ট দুই প্রতীকী পক্ষ, এক পক্ষে প্রতিবাদহীন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে-যাওয়া সিগারেট, আর এক পক্ষে নির্মম, বিলাসী ধূমপায়ীর দল।

এক পক্ষে শোষকশ্রেণী, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিপালিত

মানুষ, আর এক পক্ষে শোষিত সর্বহারার দল, সমাজবাদী সমাজব্যবস্থায় মুক্তশ্বাস ফেলতে বদ্ধ পরিকর মানুষ।

বাঁচা-মরার অধিকার ও সংগ্রামের কথা প্রথম দুই চরণেই—

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন?

বাঁচা-মরা মানুষের ভাগ্যের কৌশল নয়, মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বের অধিকারে স্থিত প্রত্যয়। তাই আর মানতে রাজী নয় মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আর একদলের আরামের স্বর্গরাজ্য চালানোয়—

তোমাদের আরাম : আমাদের মৃত্যু!
এমনি ক'রে চলবে আর কত কাল?
আর কতকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকব
আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে?

* * *

তোমরা আমাদের শোষণ করছ সর্বক্ষণ—

এমন মধুর-তিক্ত ভাষণে সুকান্ত লক্ষ্য রাখে ধনিক শ্রেণীর, তাদের সমাজের নির্দেশকে। আর কবিতার শেষে সেই লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে মারে রক্তচক্ষুর শাসন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ক্রোধাক্ত কণ্ঠ—

তারপর তোমাদের অসর্তক মুহূর্তে

* * *

নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল॥

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদল করার এ যেন স্পষ্ট, সরব, নিষ্ঠুর সত্যে দীপ্ত উক্তি।

'দেশলাই কাঠি' কবিতায় বিপ্লবী চেতনায় শাশ্বত যে সাম্যবাদী সমাজের জনগণশক্তি, তাকে, তাদের শক্তিকে অকৃত্রিম স্বীকৃতি দানের কথা—

আমাদের কি অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার,

তবু কেন বোঝ না,

আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে, পকেটে,

'চিল' কবিতায় যুদ্ধে পর্যুদস্ত, পরাজিত মুসোলিনীর প্রতীক 'চিল'-এর যে ব্যঞ্জনাময় ব্যাখ্যা, তার মূলেও শোষিত সমাজ-মানুষের আশা-ভরসার কথা। মৃত চিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সার্থক রূপ। তার পরাজয়েই তো সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপ রচনা!

অন্যদিকে সংগে সংগে সর্বহারাদেও বাঁচার বসন্ত-বায়ু গ্রহণ!

হাতে যাদের ছিল প্রাণ ধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে।

এমন সিদ্ধান্ত চিত্রের ব্যঞ্জনায় স্পষ্টত সভ্যতার রথচক্রে ইতিহাসের নির্দেশ। মহাকালের অনন্ত সঙ্গী মহত্তম মানবতার হাত ধরে সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস-স্তূপের ওপর দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ-মানুষের নিরাসক্ত অগ্রগমনের স্বীকৃতি সত্য!

'সিঁড়ি' কবিতার অন্তে আছে সেই আগামী দিনের স্বর্ণ-সমাজের কথা—যেদিন আদৌ দূরে নেই। কালের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থাই চিরকাল থাকে না—যদি তা না মহত্তম মানব্যের সত্যে বিশ্বাসী থাকে! তাই যে সমাজ মানব্যকে পদদলিত করে যাওয়ার বিধান দেয়, সেই সমাজশক্তির অন্তিম দিন আগত প্রায়!

……আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন॥

এখানে শেষতম চরণে যে সম্ভাবনার কথা 'হতে পারে' এমন শব্দ প্রয়োগে ব্যক্ত, তা শ্লেষের পোষাকে তিক্ত-স্বভাবী।

মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কবি, কমিউনিস্ট কবি সর্বহারাদের যন্ত্রণার ভাষা, মৌন মূক কথাকেই কাব্যে রূপ দিতে বদ্ধ-পরিকর। 'কলম' কবিতার প্রতীকে কবি মুখর করতে প্রয়াসী, প্রতিবাদে-বিদ্রোহে নতুন জীবন-অভ্যর্থনায় সোচ্চার করতে উৎসাহী প্রধানত শোষিত মানুষকেই। তাদের ইতিহাস তাদের নিজেদের দিয়েই লিখতে হবে।

তাই কলমকে সম্বোধন করে কবির চেতনা জাগ্রত করার সফল প্রয়াস—

হে কলম! হে লেখনী! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্কচিহ্ন রেখে দেবে মুখে?

সংঘবদ্ধ শোষিত মানুষই শোষকের বিরুদ্ধে রক্তের কালিতে লিখবে ইতিহাস। শোষক সমাজ পুঁজিবাদী দুনিয়ার সৃষ্টি, শোষিত সমাজ নিজেদেরই ভিতরের শক্তি থেকে সৃষ্ট। তাই কলমেরই ক্ষমতা আছে কবির সিদ্ধান্ত-বাক্যের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়ার—

আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম
আনো দিকে দিকে।

'চারাগাছ' কবিতায় কবি স্পষ্ট করে শোষিতদের পক্ষে দাঁড়িয়েই হঠাৎ লক্ষ্য করে—

অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

এমন হঠাৎ দেখার পর পুরনো অট্টালিকা আর চারাগাছের মধ্যেকার সম্পর্কের সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় কিশোর কবির বিদ্রোহ-চেতনায় দীপ্ত বিশ্বাস তথা উপলব্ধি—

মনে হয়, এই সব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের

ধারায় ধারায় জন্ম,

ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।

'চারাগাছ' কবিতায় প্রত্যক্ষ ধনতান্ত্রিক সমাজের ও সাম্যবাদী সমাজের ইঙ্গিত নেই, আছে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী বিদ্রোহের প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবি সুকান্তর একটি অসাধারণ, দরদী হৃদয়ের রসে সিক্ত, বলিষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সার্থক ছোটগল্পের রস আর কাব্যরস একাকার।

কবি সুকান্ত—আয়নার সামনে দাঁড়ানো ও আয়নার প্রতিবিম্বে স্থিত দুই সুকান্তর দুজনের দুজনকে দেখে নিরাসক্ত হয়ে যাওয়ার কবিতা।

তাই গল্পের মেজাজ কবিতাকে আহত করেনি, কবিতায় গল্পের বিচরণ ও বিস্তার আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত নয়। দুই সত্তা নিরাসক্ত, আবার শিল্পের মহত্তম রূপের ব্যঞ্জনায় এক রূপে গভীর আসক্ত।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতার বিরাট প্রাসাদের মালিক পক্ষের সংগে হয়ত বা 'ভালো খাবার' কবিতার নায়েব-মোসাহেব পরিবৃত ধনপতি পালের এক গোপন আঁতাত। নাকি প্রাসাদটি হয়ত ধনপতি পালেরই, যিনি—

............জমিদার মস্ত

সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,

তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে

আয়তনে হারালেন মোটা কোলা ব্যাঙকে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষকদের স্বভাব হল ঘৃণ্য জোঁকের মত—গোপনে নিঃসাড়ে রক্ত চুষে খাওয়ার স্বভাব। এই সমাজ-প্রতিনিধির বাইরে রাজবেশ, ভিতরে গরীবদের রক্ত-লুটকরা লোহিত কণিকা নিয়ে জীবন-যাপন প্রক্রিয়া।

সর্ব খাদ্যে অরুচি এমন ধনপতি পালের—

নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি :

কি খাদ্য চাই? কী সে খেতে উত্তম অতি?

নায়েবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ধূর্ত ধনপতির সহাস্য সন্তর্পিত উত্তরটি মোক্ষম—

বলা ভারি শক্ত,
সব চেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত॥

'একটি মোরগের কাহিনী'র পরিণামী অংশে সেই লোভনীয় খাদ্যেরই নিপুণ বিলাসী ব্যবস্থা।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে গেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥

শোষিত আর শোষক স্পষ্ট করে এই দুই শ্রেণীকে, দুই শিবিরকে তার নব সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের মূলে সব সময় স্থির-নির্দিষ্ট করে রাখে সুকান্ত। 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় তাদেরই চলচ্চিত্রের মত চলমান ছবি।

আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিষয়ে এক সার্থক 'সর্ট ফিল্ম' হয়ে ওঠার সংকেত আছে 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতার বিষয়ে, আঙ্গিকে।

সমাজ-সৃষ্টির আদিকাল থেকে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্যে অন্তঃশীল ছিল যে শোষণ, অত্যাচার, অবজ্ঞা ও অবহেলা, একটি মোরগ সেই ঐতিহ্যবাহিত ধনতান্ত্রিক সমাজভাবনার সার্থক প্রতিভূ। মোরগের জীবনাচরণে শোষিত সর্বহারাদের সমবেত, উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।

অন্য সব প্রতীকী কবিতার শুরু যেভাবে, 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় সেই পদ্ধতি পরিত্যক্ত। যেমন 'চারাগাছ' কবিতায় কবিতার মধ্য অংশের কাছাকাছি কবির স্বীকৃতি—

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

'সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি'—এই সব প্রতীকী কবিতার শুরু সাদা-মাটা 'স্টেটমেণ্ট' দিয়েই।

কিন্তু 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতা?

একেবারে ছোটগল্পের আরম্ভের মত হঠাৎ সংশয়মূলক বা প্রশ্নসূচক ভাবাবহে কবিতাটির শুরু—

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সংগে।

এই স্তবকের পরেই কবিতায় গল্পের একমুখী বিস্তার। একটি প্রচ্ছন্ন কাহিনী গড়াতে শুরু করে গদ্যছন্দের চরণের স্রোত ধরে। একটি চিরকালের বুর্জোয়া সমাজ-মানসের বৈপরীত্যের ছবি—একদিকে মোরগের 'সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ', আর একদিকে সহানুভূতিহীন 'বিরাট শক্ত ইমারত'।

পরের স্তবকে মোরগের খাদ্যাভাবজনিত সুতীক্ষ্ণ চীৎকারের একটি বিপরীত ব্যবস্থা—

মিলতে লাগল।
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!

কিন্তু সুকান্ত অতি কৌশলে সাময়িক সমাধানের পাশে আর এক বড় সমস্যার চিত্র আঁকে অবলীলায়—

আস্তাকুঁড়েও এল অংশীদার—
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

এবার তীব্র খাদ্যাভাবে অস্থির, উত্তেজিত মোরগ। সমস্ত উত্তেজনা নিষ্ফল মাথা কুটে মরে সমাধানহীন অসহায়তার মধ্যে।

এমন অসহায়তার মধ্যেও স্বপ্ন?

অপূর্ব শ্লেষ মেশানো কবিত্বের জন্ম স্তবকটির শেষতম দুটি চরণে—

ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার।'

সমগ্র কবিতাটিই যদি ছোট গল্পের আত্মার সংগে মিশে থাকে, তবে কবিতার শাস্তিতে ছোট গল্পেরই সেই 'চরমক্ষণ' বা 'মহামুহূর্ত'।

মোরগটি একদিন প্রাসাদে ঢোকার অধিকার পায় বটে

অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে।

সামান্য একটি মোরগ হয়েছে একটি বিখ্যাত কবিতার বিষয়। নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর 'কলকাতার যীশু', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুকু না ফুটুক' কবিতার সেই দড়ি পাকানো গাছের মতই।

বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক আন্তন চেখভের কথা—

'আমি একটা এ্যাসট্রেকে নিয়েও গল্প লিখতে পারি'। তাঁর মতে 'বাঁধা কপির ঝোল'-ও গল্পের বিষয় হতে বাধা নেই।

ওয়াল্ট হুইটম্যান কবিতার বিষয় সম্পর্কে বলেন—'রিজেক্ট নাথিং।'

সুকান্ত সামান্য একটি মোরগকে করে কবিতার লক্ষ্য-বস্তু, গল্পের নায়কও।

এককালে বনফুল গল্প লিখেছেন একটি পোস্ট-কার্ডে চিঠি লেখার মাপে।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতার গভীরাশ্রয়ী অনুভূতি ও ব্যঞ্জনায় সেইরকম মাপের একটি ছোটগল্পও বা।

কিন্তু বিষয় মোরগ হলে কি হবে, এর গভীরতম অর্থের দ্যোতনায় আছে নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনবোধ, তন্নিহিত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা। কবিতাটিতে সুকান্তর অন্য কবিতার মত কোন বিদ্রোহের কথা নেই, নেই কোন 'ইজ্‌ম্'-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব, আছে সর্বহারা মানুষের পক্ষে অসম্ভব অবিশ্বাস্য মানবতাধ্বংসকারী রূপ।

মোরগটি কি কবি সুকান্ত স্বয়ং, যে সেকালের সর্বহারা মানুষের জন্য পরিশ্রম করতে করতে কর্মে নিমজ্জিত অবস্থায় দীনহীন বেশে একুশ বছরেই হয়ত বা অজ্ঞাত বিধাতার বিধানে ধনিক শ্রেণীর, সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থার শিকার হয়ে মৃত্যু বুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জগত থেকে। 'খাবার হিসেবে' মোরগের মধ্যে কি কবি সুকান্তর ছায়া?

এই কবিই কি সর্বকালের সর্বহারাদের প্রতিনিধির দায়িত্ব-নেওয়া কবি? রূঢ় বাস্তব সত্যকে শিল্পের মায়ায় প্রতিচিত্রণের সৎ, সনিষ্ঠ কবি সুকান্ত?

নিয়তির মত সত্য অসহায় মোরগের তথা সর্বহারা শোষিত মানুষের এমন অবস্থায় ভূমিকা কী? মানুষ কি ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে উজ্জ্বল সমাজ ব্যবস্থার ক্রীড়নক থাকবে চিরকাল? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন ধনিকশ্রেণীর অন্ধকার শক্তির সংগে কি তার কোন সংগ্রাম করার পথ নেই?

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটির পরিণামে সেরকম কোন প্রত্যয়কে, রক্তিম সূর্যের আকাশ দীপ্ত করে দেখায় নি কবি। দেখায় নি বলেই এর সমস্ত 'নেগেশান'-এর মধ্যেই আছে 'এ্যাফারমেশান্'। সমস্ত কালের অবহেলিত মানুষের বিপর্যস্ত মানবিকতা থেকেই এই কবিতার সিদ্ধান্তের যন্ত্রণাতিক্ত উদ্ভব। আবহমান কাল বেঁচে থাকার অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করার পর মৃত্যু-যন্ত্রণায় নিঃশেষ হয়ে যে মোরগটি নিজেকে ধনিক শ্রেণীর খাবার টেবিলে আত্মসমর্পণ করে, সে জানে না সে তার আত্মসমর্পণে ধনতান্ত্রিক জীবনকে পুষ্ট করে দিয়ে যায়।

কবি সুকান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও জীবনধর্মী কবিত্বের প্রবাহে সমগ্র কবিতাতেই রাখে তার নতুন সমাজবাদের ব্যঞ্জনা। কবিতাটির আদ্যন্ত আছে জ্বালা-ধরা শ্লেষ, চাবুক মারার মত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ!

এমন ব্যঙ্গই স্বভাবী পাঠকের কাছে জীবনের সমস্ত 'নেগেশান্'কে করেছে 'এ্যাফারমেশান্'! কবিতাটি প্রতীকিতার নামে প্রচার হয়নি, হয়নি সর্বকালের মানুষের এমন অসহায় মৃত্যুর জন্য হাহাকারে, কান্নায় বিষাদ কণ্ঠ!

কবি সুকান্ত সামাজিক বিবর্তনবাদের এক জ্বলন্ত অধ্যায়ের রূপকার। ভাষ্যকারও বটে। সুকান্তর বিশ্বাস মার্কস্‌বাদে-লেনিনবাদে, সুকান্তর বিশ্বাস উনিশ শ পাঁচ সালের সেই রাশিয়ার বিপ্লবে, সুকান্তর বিশ্বাস রাশিয়ার সেই উনিশ শ সতেরোর অভ্যুত্থানগুলির নব নব পরিণামে। কারণ সেই একটি বিশেষ দেশের বিশেষ নেতার প্রয়াস

তো গোটা পৃথিবীর। তাই কমিউনিস্ট কর্মী সুকান্তর এমন বিশ্বাস কবি সুকান্তর লেখনীতে হয় নতুন রাজনীতির, নতুন সমাজরূপের যথার্থ মূল্যায়ন।

কিন্তু সুকান্ত যে এদেশের মানুষ, কবি। সে যে সাম্রাজ্যবাদীদের গড়া এক উপনিবেশের অধিবাসী। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ও সমাজবাদের ঠিকানায় তার অনুসন্ধান পেলেও দেশের ঠিকানা কি?

আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,

*   *   *

আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে—
আমি প্রতিদিন ঘুরি,

*   *   *

ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো॥

এক মুক্ত স্বদেশ, এক মুক্ত সমাজের জন্য বুঝিবা সুকান্তর অহল্যার প্রতীক্ষা!

সপ্তম অধ্যায়

সুকান্তর রাজনীতি ও রাজনৈতিক কবিতা

উনিশ শ উনচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সাল-এর মধ্যবর্তী কাল।

কিশোর কবি সুকান্তর কবি-মানসের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির কাল!

এমন সময়-পরিধিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক সর্ব ভারতীয় আন্দোলনে, বিপ্লবী মতাদর্শে এক অগ্নিপরীক্ষার কাল!

এমন রাজনীতির সন্ধিলগ্নে কিশোর কবি হয় তরুণতম সভ্য—সভ্য সমস্ত সংগঠনের, সমস্ত সুস্থ সমাজবাদী আন্দোলনের, সভ্য হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির!

স্কুলের ছাত্র সুকান্ত তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা শুধু নয়, অন্যতম পুরুষও!

বেলেঘাটা অঞ্চলের মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট-কর্মীদের মধ্যেকার অস্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজের ভার লাঘব করতে উৎসুক সুকান্ত!

'জনরক্ষা সমিতি' তখন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত।

সুকান্ত তার সারাদিনের এক নিষ্ঠাবান, সৎ, আবেগপ্রাণ কর্মী!

অগণন উজ্জ্বল পোষ্টার লিখনে সুকান্ত।

সাধারণ মানুষকে প্রতিরক্ষা কাজে উৎসাহ দানে ব্যস্ত সুকান্ত।

কমিউনিষ্ট কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে স্থির নিঃশঙ্ক শ্রোতা সুকান্ত।

কমিউনিস্ট-পার্টির রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের কাজে প্রথম প্রধান উৎসাহী কিশোর সুকান্ত।

ব্ল্যাক-আউটের রাতে চোখে ঠুলি-লাগানো ল্যাম্পপোস্টের কাছাকাছি সারা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার মারবে কে? সেখানেও কিশোর-কর্মী সুকান্ত!

এমন ছাত্র, কর্মী, সংগঠক, আন্দোলনকারী, পোষ্টার-লিপিকার গণসংযোগকারী সুকান্তর মনের গভীরে, কবিমনের নিঃসঙ্গ অনুভূতির জগতে জন্ম হতে থাকে রাজনীতির বিশ্বাস, সাম্যবাদের রক্তাক্ত প্রত্যয়, সমাজবাদী জীবনবোধের আবেগদীপ্ত স্বপ্ন-কল্পনা।

কিশোর কবির অপরিণত মন বটে, কিন্তু ভিতরে সে যে কিশোর-পুরুষ! তাই তার নিষ্ঠা, বোধ, বিশ্বাস, মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি 'ডাইনামিক্' হয়ে ওঠে সাম্যবাদী চেতনার প্রবল স্রোতে।

সুকান্ত হয় সেকালের সাচ্চা কমিউনিস্ট—হয় প্রত্যক্ষত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরুণতম মূল্যবান এক সদস্য!

এমন একজন কমিউনিস্ট কবিতা লিখবেন কোন্ বিষয় নিয়ে? কোন ভাষায়? কি তার পরিণামী চেতনার পরিচয় কাব্যে?

বাইরে সুকান্ত কমিউনিস্ট, ভিতরে কবি-কমিউনিস্ট, বা কমিউনিস্ট কবি!

বিশ্বখ্যাত কর্মী-রাজনীতিবিদ হয়েও কবি!—কমরেড লেনিন!

অসাধারণ বিপ্লবী, প্রখর রাজনীতির স্রষ্টা হয়েও কবি! মাও সে তুং!

আবার মূলত প্রতিভাবান কবি হয়েও কমিউমিস্ট—পাবলো নেরুদা!

আমাদের দেশেও তার উদাহরণ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়!

সুকান্ত এঁদের দলে। সুকান্ত কবি এবং কমিউনিস্ট—তুই রূপের অদ্ভুত মিলনের প্রতীক-প্রতিম কিশোর-পুরুষ। কবি-পুরুষ!

সুকান্তয় কবিতায় রাজনীতি আছে, শ্লোগান আছে, পোষ্টার লিপির ভাষা আছে, আছে সাম্যবাদী তত্ত্বের সরব ঘোষণা। কিন্তু এ সমস্তই বিফল হয়নি, হয়নি কেবলমাত্র সমকালেরই অভাব-অভিযোগের প্রতিবাদ-কণ্ঠ মাত্র!

যেহেতু খাঁটি-কবির আবেগ ছিল সুকান্তর, খাঁটি কমিউনিস্টের বিবেক ছিল সুকান্তর মধ্যে, তাই তার রাজনীতি-আশ্রয়, শ্লোগানের শব্দ, পোষ্টার লিপির দেওয়াল-শোভা নীরস হয়নি, হয়নি সমসময়বর্তী

কালের সংবাদ, হয়েছে নতুন জগতের, নতুন কথার, নতুন জীবন ও সমাজের এবং বিশ্বাসের কবিতাই।

সুকান্তর রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্যরূপ ও শাশ্বত আধার পেতে আগ্রহী ছিল শ্রমজীবী মানুষ ও শোষিত মানুষের ঐক্যের মধ্যে। সুবিশাল গণঐক্য ও বিশেষভাবে শোষিত মানুষের ঐক্যই তার রাজনৈতিক মতাদর্শের, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রাণবাণী।

এই বাণীর বাণীরূপ একাধিক কবিতায়।

'বিবৃতি' কবিতায় কবি এই সুবিশাল গণ-ঐক্যের অগণন মানুষের মধ্যে—

> আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
> কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
> অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
> নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে
> আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যোন,
> এদেশে ভাণ্ডার ভ'রে দেবে জানি নতুন য়ুক্রেন।

রাজনীতি ভাবনা গভীর না হলে, বিশ্বাসে স্থিত না হলে এমন স্তবক এক আধুনিক বাস্তবতাবাদী কবির লেখনীতে সম্ভব হত না।

সেই সংগে 'বিবৃতি' কবিতায় সেই আশ্চর্য সব পংক্তি আছে যেখানে শ্লোগানের ভাষা, কণ্ঠের সরব প্রকাশ।

> রক্তে আনো লাল
> রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

এখন অভূতপূর্ব রাজনীতি-বিশ্বাসে দীপিত কাব্যময় শ্লোগান সুকান্তই পোস্টারে পোস্টারে লিখে, দেওয়ালে-দেওয়ালে লেপে সে সময় ব্ল্যাক-আউটের কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াত।

উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের জুন মাস।

সুকান্তর রাজনীতি ভাবনার বনিয়াদ তৈরীর সময়।

কবিতায় পোস্টারের ভাষা, মিছিলের ধ্বনি, বা বিপরীতে মিছিলের

ধ্বনি হয় পোষ্টারের ভাষায় উজ্জ্বল বিদ্রোহের কবিতা—এ সবের শিক্ষা, অভিজ্ঞতার স্তূপ জড়ো হতে থাকে এই বিয়াল্লিশ সালেই।

বিয়াল্লিশ সালের জুন মাসে তার অতি-ত্বরিত রূপ-বিবর্তন।

ঠিক এই সময়কার স্মৃতিকথায় অরুণাচল বসুর একটি সুন্দর সংবাদ দান—'পায়ে হেঁটে বেলেঘাটায় ঢুকলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো দেয়ালে-দেয়ালে পরিচিত হাতের লেখা।...সেই জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংরেজ তাড়াবার জন্য; মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য লেখা নানা পোষ্টার।

......দিনে পাশের বাড়ির এক বাইরের ঘরে কাজে লাগিয়ে দিলো আমাকে। বললো, এই পোষ্টারগুলো এঁকে দে। যুদ্ধের দিনে ফ্যাসিবিরোধী নানা ছবির পোষ্টার। ও আগের থেকে অনেক সজীব। দাদাদের ফেডারেশনের কাজে যেন নতুন জীবনের প্রেরণা পেয়েছে।'

রাজনীতি, পোষ্টার, শ্লোগান, বিদ্রোহ ইত্যাদিকে কবিতার ফ্রেমে ধরা, অথবা কবিতাকে রাজনীতি, পোষ্টার, শ্লোগান, বিদ্রোহ-ভাবনায় রক্ত-মাংস-মজ্জায় প্রাণিত করে তোলায় কিশোর কবি-মন কি রকম প্রস্তুত ছিল, এমন সব ঘটনা তার পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণ।

পোষ্টারের শ্লোগান, মিছিলের শ্লোগানও যে খাঁটি কবিতা হতে পারে, সুকান্তর কবিতায় তার সার্থক প্রয়োগ, পরীক্ষা, সফলতা।

'সুকান্ত' শীর্ষক এক স্মৃতিচারণমূলক রচনায় অবন্তীকুমার সান্যালের একটি সুন্দর, যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণী বাক্য—'একমাত্র সুকান্তর কবিতা থেকে এমন প্রচুর শ্লোগান জড়ো করা যায় যা দিয়ে একটা পুরো মিছিলকে সাজানো চলে, আর সে শ্লোগানগুলির বেশীর ভাগ অব্যর্থ বলেই কবিতা অথবা কবিতা বলেই অব্যর্থ।'

'প্রস্তুত' কবিতায় সুকান্ত যখন লেখে—

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;

তখন মিছিলে দেওয়া অসংখ্য মানুষের হাত-উঁচু-করা চিত্র, কণ্ঠস্বরে

দাবিয়ে রাখা বিপরীত পক্ষের ভীতির রূপাভাসের শ্লোগানের কথাই অনুভবে ধ্বনিত হয়ে যায়।

দ্বারে মৃত্যু,
বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর?

'দুরাশার মৃত্যু' কবিতার প্রথমের এই তিন চরণ কি পোস্টারের রঙিন বিচিত্র কালির লিখনে রঞ্জিত হয়ে ওঠে না এখনকার পাঠকের মনে, অথচ এমন চরণের অর্থে আছে কাব্যের আবেগ, কবির জিজ্ঞাসা!

কবিতার চরণের দুর্দান্ত-আবেগ আর গভীর অর্থদ্যোতনায় তো পোস্টার-পাঠকদের শ্লোগান দীপ্ত করা যায় এমন সব চরণেই—

দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা,
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।

একজন রাজনীতিবিদ কবির লেখনীতে এমন সব চরণই তো গণশিক্ষায় ও গণ আন্দোলনে জাগ্রত করার একমাত্র উপায়! একজন কমিউনিস্ট কবির এই চেতনাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইতিহাসবোধে, বিপ্লবের শপথে শিক্ষিত করতে পারে।

জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।
অক্টোবরকে জুলাই হতে হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥

'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতার সিদ্ধান্তের এই চরণ দুটি যেন পোস্টারের লেখা থেকেই জুড়ে দেওয়া, অথবা কবিতার মধ্যেই পোস্টারে বা শ্লোগানে

বসাবার মত করে লেখা। উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসকে মনে রেখে, সমকালকে শ্লোগানে-পোস্টারে ধরে রেখে রাজনৈতিক কবিতা লেখার এমন সার্থক প্রয়াস সুকান্তর পক্ষেই সম্ভব। এবং সুকান্তই তার প্রথম প্রয়োগকর্তা, প্রথম সার্থক কবিও।

কোন এক কারখানার ধর্মঘটে বন্ধ দরজায় যদি নানাভাবে, নানা কালিতে স্পষ্ট বড় বড় করে 'মজুরদের ঝড়' কবিতার এমন প্রথম কয়েকটা চরণ লেখা থাকে,—

এখন এই তো সময়—
কই? কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘট ভাঙা দালালরা;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এসো!
জাহান্নামে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো।

তা হলে কি তা একজন কমিউনিস্ট-সংগঠকের যথার্থ ক্রোধাক্ত ভাষা প্রকাশের উপযোগী হবে না? এমন চরণে সুকান্ত সত্যিকারের কমিউনিস্ট কর্মী ও সংগঠকই বটে!

কিন্তু এই কবিতার শেষ দিকে যেন এক সাম্যবাদী কবির বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবি-প্রাণের আবেগে 'আমিই লেনিন' হয়ে বলে ওঠার কণ্ঠ—

ঝড় আসছে—সেই ঝড়:
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।
আর হুঁশিয়ার মজুর:
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি॥

'বোধন' কবিতার বিখ্যাত সব চরণ—

শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার!

তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব দিবি কি তার ?

*　　　*　　　*

শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

অত্যদ্ভুত কবিতার আবেগে, শিল্পী-প্রাণের জ্বালায় পোস্টারের অমোঘ নির্দেশের তর্জনী-তোলা শাসনের, সাবধান-বাণীর ভাষা হয়ে উঠেছে।

সুকান্তর 'বোধন' কবিতা সাম্যবাদী মতাদর্শে, শ্লোগানে, রাজনীতি-ভাবনায়, বিদ্রোহ চেতনায়, গণবিক্ষোভের প্রাণের শক্তিতে এক সার্থক কবিতা।

কৃষকদের নিয়ে প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের মতই নিজেকে কৃষকদের মধ্যে স্থিত করে 'কৃষকের গান' কবিতায় প্রতিজ্ঞা ব্যক্য শোনায়—

আমার প্রতিজ্ঞা, শুনেছ কি
(গোপন একান্ত একপণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।

'১লা মে-র কবিতা '৪৬'-এর মধ্যে যেনবা রাজনৈতিক গণমানুষের নেতা হয়ে কবি সুকান্ত অসাধারণ কাব্যময়তায় রাজনীতির কথাই বলে—

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥

সুকান্তর কালে কমিউনিস্ট-রাজনীতির প্রধান প্রতীক ছিল লাল রঙ, পতাকাও লাল। এখানে সর্বহারাদের হয়ে সুকান্তর যে রাজনৈতিক

সিদ্ধান্ত—যা বিদ্রোহ—বিপ্লবের শেষ কথা—তার মধ্যেও 'লাল আগুন' শব্দ প্রয়োগ করেছে। রাজনীতিকে কবিতা করার ভাষা, পোস্টার-লিখনকে কবিতায় সমৃদ্ধ করা ও সমবেত শ্লোগানকে বিদ্রোহী কবিতার ভাষায় সবল করার সার্থক প্রয়াস সুকান্তর কবিতায়।

রাজনীতির সংগে জড়িত 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ', 'বুর্জোয়া'—এমন সব শব্দ। সুকান্ত কখনো প্রত্যক্ষ শব্দে, কখনো বা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এসবের প্রয়োগ করে তার রাজনীতি-চেতনার, মতাদর্শ ও বিশ্বাসের সার্থক রূপ রচনা করেছে একাধিক কবিতায়।

সুকান্তর যে কোন কবিতাকে শ্লোগানে বসানো যায়, পোস্টারের লিপিতে সাজানো যায়, সাম্যবাদের বিশ্বাসে ধরা যায়। আবার বিপরীতে শ্লোগান, পোস্টার, সাম্যবাদী চেতনাই হয়েছে কবিতা সুকান্তর লেখনীতে, সুকান্তর কবিপ্রাণের আবেগে, তাগিদে। প্রতীকী কবিতাগুলিতে আছে সাম্যবাদী ভাব-ভাবনার ইঙ্গিতময়তা, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বক্তব্য। সাধারণ কবিতায় আছে কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতি-চেতনা, কখনো শ্লোগান, কখনো বা সাময়িক কালের জ্বলন্ত প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিদ্রোহ-বিপ্লবের কথা!

এভাবেই সুকান্তর কবিতায় আছে রাজনীতি, আছে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সার্থক প্রকাশ!

'সুকান্তর একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণাচল বসুর এক অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণে সুকান্তর রাজনীতি-ভাবনার সুন্দর স্বীকৃতি পাই—

সুকান্ত কখনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতো না, কিন্তু একবার বলেছিল অত্যন্ত নিবিড় স্বরে—'জীবনটা দেবো পার্টির জন্যে, জীবনটা দিয়ে দেবো।'

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কবি সুকান্তর এমন অকপট আন্তরিক স্বীকৃতি, সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়ার এমন আত্ম-ভাষ্য তাকে সার্থক রাজনৈতিক-কর্মী করেছিল ঠিকই, সেই সংগে কবি-প্রাণে এনে দিয়েছিল সমান বিশ্বাস—

চলে যাবো, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—
অবশেষে সব কাজ সেরে।

'ছাড়পত্র' কবিতার অন্তিম বাক্যে সুকান্তর 'ইতিহাস' হওয়ার যে বাসনা, তা যেন চিরকালের কমিউনিস্ট কবিকুলের ইতিহাস রচনারই বাসনা—যে ইতিহাসের প্রথম পাতায় প্রথম নাম—কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কবি-বন্ধু অরুণাচল বসু সুকান্তর নিজেরই দেওয়া 'ছাড়পত্র' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে'-র শিশুটি আসলে 'কমিউনিস্ট পার্টি'। আর তখনকার দিনে দেশে দেশে আকারে সে পার্টি অত্যন্ত ছোট, তাই 'খর্বদেহ' ও 'নিঃসহায়'। এবং তার ঐ 'মুষ্টিবদ্ধ হাত' আসলে ঐ কমিউনিষ্ট পার্টিতে চলিত 'রেডস্যালুট' জাতীয় ব্যাপার।'

সুকান্তর এই ব্যাখ্যায় কবি-বন্ধুর টীকা—'অর্থাৎ এই কবিতার বাইরের ভাবটা যত বড়ই হোক, কমিউনিস্ট পার্টি তথা কমিউনিজ্‌ম্‌কে একটি সদ্যজাত শিশুর চিত্রকল্পে রূপ দেবার সচেতন পরিকল্পনা থেকেই ওর এই কবিতাটির রচনা।'

বস্তুত 'ছাড়পত্র' কবিতাটি শেষ দিকে রোগশয্যায় শয্যাশায়ী কিশোর কবির বিগত বছর গুলির জীবন দিয়ে সংগ্রহ করা রাজনীতির, অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী-করা রাজনীতি-চেতনা ও ভাবনার নিপুণ দলিল।

সুকান্তর রাজনীতি করা সম্পর্কে রাজনীতির বিশ্বাস এবং সেই সংগে কবিতা লেখার প্রসঙ্গে অরুণাচল বসুর আর এক স্মৃতিচারণমূলক সার্থক বিশ্লেষণ—

'সুকান্ত নিছক রাজনীতি করার জন্য কবিতা লেখা ছেড়ে দেবার কিন্তু ছিল দারুণ বিপক্ষে।······কবিতাই তো কবির জীবন। আর জীবনের বাইরে রাজনীতি বা আদর্শগত কাজ বলে কবির কিছু থাকতে পারে না। এই কঠোর সত্যটি সুকান্ত উপলব্ধি করেছিল।'

এমন উপলব্ধিরই সামগ্রিক, সর্বাবয়ব প্রকাশ সুকান্তর অসংখ্য রাজনীতি চকিত কবিতা।

'ছাড়পত্র' কবিতায় কবির নিজ বিশ্বাসের পার্টির প্রতীকী প্রয়োগ। 'ছাড়পত্র' কবির একুশ বছরের পরিসরেই পরিণত জীবন, মন ও মননের কবিতা।

কমিউনিস্ট রাজনীতি তখন বই পড়া আর লোকের মুখের আলোচনায় শোনার অভিজ্ঞতায় আবেগ-দীপ্ত হয়ে আছে সুকান্তর মধ্যে।

অর্থাৎ সুকান্ত তখনো বয়সে শিশুর শেষ স্তরে, কমিউনিস্ট হয়নি লিখিতভাবে। মনের অভিজ্ঞতায় দেশসেবার আবেগ আছে, কর্মিষ্ঠতা আছে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু রক্তের আত্মীয়তায় গ্রহণ করার মানসিকতা হয়নি।

অথচ প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে পাঠ্য গ্রন্থ থেকে জেনেই লেখে 'অভিবাদন' কবিতার সেই রাজনৈতিক নির্দেশ-চিহ্নিত উপসংহার স্তবক—

বন্ধু, আজিকে দোদুল্যমান পৃথ্বী,
আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি ;
তারই সূত্রপাতকে করেছি-সাধন,
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন ॥

এমন একটি স্তবকের ব্যাখ্যায় অরুণাচল বসুর টীকা-ভাষ্য—'রক্তিম অভিবাদন' স্বদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রচলিত 'রেডস্যালুটে'র বাংলা তর্জমা। আর 'সাথী' হল কমরেড।'

অথচ বিস্ময়ের বিষয়—সুকান্ত তখন কমিউনিস্ট পার্টির ধারে-কাছেও নেই।

অরুণাচল বসুর কিশোর-কবি-বন্ধুস্মরণ—'এই কবিতাটি নিয়েই শিশুকালের পর সাহিত্যের আসরে ও প্রথম পদার্পণ করলো। 'অভিবাদন' আমি দেশে বসে পড়েছিলাম। কলকাতায় ফিরলাম উনিশ শ তেতাল্লিশের মাঝামাঝি। ও তখন প্রায় সর্বসময়ের কর্মী। নানা কাগজে নিয়মিত লেখে।'

কবি সুকান্তর রাজনীতি-চেতনা বুঝিবা তার পক্ষে কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মত। অধিকার জন্ম সূত্রেই!

সে সময়ের জটিলতম নানান রাজনীতির, বিদ্রোহ-বিপ্লবের হতবুদ্ধিকর ঘোলাজলে সুকান্ত যে নিজের দল, রাজনীতি ও সাম্যবাদী পথকে সঠিক গ্রহণ করেছিল—এর স্বাক্ষর কবিতাগুলির রাজনীতির ভাষ্যে নিহিত।

সুকান্তর কবি-ব্যক্তিত্ব তার কায়া, রাজনীতি-সত্তা সেই কায়ার ছায়া। একে-অন্যে মাতা-সদ্যজাত সন্তানের নাড়ীর যোগে অচ্ছেদ্য!

অষ্টম অধ্যায়

শ্রেণী-সচেতনা ও কবি সুকান্ত

একেবারে একালের শ্রেণী-সচেতনা আর কবি সুকান্তর কাব্য-ভাবনা!

এ দুয়ের মধ্যে যোগ কেমন?

সুকান্ত নিশ্চিতই একালেরও, কিন্তু একেবারে আধুনিক ইতিহাসের পিছনে কয়েকটি স্তর পিছন ফিরে ফিরে অতিক্রমণে আমরা দেখি সেকালের সশরীর সুকান্তকে!

এই তো আজ থেকে বছর কুড়ি আগে আমরা অতিক্রম করেছি সাতষট্টি সাল থেকে একাত্তর-বাহাত্তর সালের মধ্যবর্তীকালের নকশাল আন্দোলনকে!

প্রত্যক্ষ করেছি উনিশ শ চৌষট্টি সালের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—যার সত্যিকারের পার্টি সদস্য, কর্মী, অন্যতম সংগঠক, আত্মার আত্মীয় ছিল কবি সুকান্ত—তারই সকরুণ দ্বিধাবিভক্তির ইতিহাস!

তারও আগে জোশেফ স্তালিনের মৃত্যু, রাশিয়ায় স্তালিনবাদের অবসান! কমিউনিস্ট দুনিয়ায় রাশিয়া ও চীনের আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট মতবাদের রূঢ় তাত্ত্বিক লড়াইয়ের তীব্রতম রূপ-রূপায়ণ!

আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ—উনিশ শ' সাতচল্লিশে!

এরও আগে সুকান্তর সচেতন কবিসত্তা ও রাজনৈতিক কর্মী-সত্তার চিরকালের অবসান ঘটে তার অকাল মৃত্যুতে!

চারের দশকের সাম্যবাদী আন্দোলন, সাতের দশকের একেবারে শেষ-পৌছানো সময়ের মানুষের শ্রেণী সচেতনা!

সুকান্তর কবিতা কি এই শ্রেণী-সচেনার যথার্থ টীকা-ভাষ্য?

এই প্রশ্ন সর্বকালের স্বভাবী পাঠকদের মনে জাগবেই!

সুকান্ত মূলত কবি, কিন্তু—

'কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সংগে মেলাতে পেরেছিল, তার ব্যক্তিত্বে কোন দ্বিধা ছিল না।' বলেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

আবার তেরো শ' একান্ন সালের পয়লা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, 'এবারকার বসন্তের প্রথম দিন'-টিতে কলকাতা থেকে সুকান্ত তার মেজ বৌদির উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে জানায়—

'আমি যে জনতার কবি হতে চাই. জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন মূলত কবি, এবং সর্বক্ষেত্রে কবিতাই তাঁর একমাত্র নামাবলী, কবি সুকান্তর পক্ষে ওপরের দুটি বক্তব্য মিলিয়ে দিলে যে সত্য স্পষ্ট, তা অনন্য এবং সুকান্ত কবি-কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট কবি!

এবং সেই কারণেই যেহেতু একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের তত্ত্বভাবনার মূল ভিত্তিই হল শ্রেণীসচেতনা, তাই সুকান্তর কবি-ভাবনায় এমন তাত্ত্বিক শ্রেণীসচেতনার রসরূপের বৈশিষ্ট্য কেমন?

শ্রেণীসচেতনা অবশ্যই অর্বাচীন বিষয় নয়, নয় বিশ শতকেই তার জন্ম! তারও আছে ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতিমুখীন অবধারিত প্রবাহ!

সমাজ সভ্যতার জন্মের সংগে সংগে আসে শ্রেণী সম্পর্ক।

একেবারে উৎসে আছে খাঁটি গ্রাম-সমাজ, তা থেকে সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সংগে তাল রেখে একে একে এগোয় সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র এবং শ্রেণীসচেতনার সর্বশেষ সর্বহারাতন্ত্র!

বাংলাদেশে ও সাহিত্যে সর্বপ্রথম আসে দেশচেতনা, তা থেকে দেখা দেয় সমাজচেতনা, শেষে শ্রেণী-সচেতনা।

বুঝিবা শুঁয়াপোকা থেকে ক্রমশ প্রজাপতিতে অবধারিত রূপান্তর!

বাংলাদেশের উনিশ শতক—দেশের রাজনীতির প্রবল ঝঞ্ঝায় উন্মত্ত, উদ্ধত রক্তিম আকাশ! এরই দ্বিতীয়ার্ধে দেশের রাজনীতিতে ভয়ংকর ঝড় এনেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সে সময়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে নবোদ্ভূত দেশপ্রেম তথা দেশচেতনাকে ব্যঙ্গ ও রসিকতার খাতে বইয়ে দেন দ্বিজেন্দ্রলাল,

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ তাঁদের তীক্ষ্ণধী লেখনীতে।

'বিলাত ফের্তা' গানে কঠিন চাবুক উদ্যত দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে—'আমরা হ্যাট, বুট আর প্যান্ট কোট পরে / সেজেছি বিলাতি বাঁদর।' 'আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে/বড্ডই ভালবাসি।'

ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিত', ইন্দ্রনাথের 'ভারতউদ্ধার কাব্য', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী', 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী', 'কৌতুককণা' ইত্যাদিতে তিক্তদশা ব্যঙ্গের রস স্বতঃ-উৎসারিত।

উনিশ শতকের দেশ সচেতনায় একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন দেশের মুক্তিকামনায় রূপান্তরিত, প্রমাণ—নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'র চতুর্থ সর্গে মোহনলালের যুদ্ধ-বিরতির পর সেই মূর্ছা-ভঙ্গের কণ্ঠের অসামান্য খেদোক্তি—'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ, / বারেক ফিরিয়া চাও,—ওহে দিনমণি! / তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন / আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ-রজনী।'

অন্যদিকে, আত্ম-সমালোচনা সমাজ-সমালোচনায় দীপিত, প্রমাণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' যেমন, তার থেকেও বেশী 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে—'এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূলফুল ভাবি।'

এমন আত্ম-সমালোচনা ও সমাজ-সমালোচনায় সম্পূর্ণ আত্মস্থ হওয়ার পর বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই দেখা দেয় তীব্রতম দেশ-সচেতনা ও রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন।

উনিশ শ পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—সারাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড়!

উনিশ শ বারো সালে সেই আন্দোলন স্তিমিত। সারাদেশের উৎফুল্ল যুবপ্রাণে অসহায় হতাশা!

উনিশ শ চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত, উনিশ শ আঠারো সালে তার সমাপ্তি ঘোষণা!

এর পরবর্তী অধ্যায় ? রাজনৈতিক আন্দোলনের আর এক পর্যায়—অসহযোগ আন্দোলন। যুবক প্রাণে আবার উদ্দীপনা উদ্যমের জোয়ার!

কিন্তু আন্দোলনের আকস্মিক স্তব্ধতায় ফিরে আসে গভীরতম সম্পর্কে চরম হতাশা, বিভ্রান্তি!

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা,' 'কালান্তর', 'চার অধ্যায়ে' এমন রাজনীতি চেতনার, দেশসেবার ও দেশ চেতনার শিল্পরূপে সম্যক স্ফূর্তি লাভ!

স্পষ্টত শ্রেণী সচেতনা তখনো দেশের রাজনীতি আন্দোলনে একালের অর্থে অস্পষ্ট।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রথম দুই দশকের শেষে সারা বিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বল রাষ্ট্র রাশিয়ায় জারের পতন ঘটে এক জনগণ-অভ্যুত্থানে। সময় উনিশ শ সতেরো সালের শীত-শেষের মার্চে। সে এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

উনিশ শ সতেরোর সাতই নভেম্বর রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব হয় সফল। মজুর শ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টির অধিনায়কত্বে মেহনতী জনগণের শাসনক্ষমতার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা! শ্রেণী-সচেতনার এক সামগ্রিক রূপাবয়ব সমগ্র বিশ্বের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যতম ভারতবর্ষে!

উনিশ শ চব্বিশ থেকে উনিশ শ উনত্রিশ সাল!

প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ও কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম! পুরোভাগে আছেন তরুণদল—মুজফ্‌ফর আহমেদ, শওকত ওসমান ও এস. এ. ডাঙ্গে।

উনিশ শ চব্বিশে বোলশেভিক ষড়যন্ত্র—কানপুর মোকদ্দমা!

উনিশ শ উনত্রিশে মিরাট ষড়যন্ত্র—কমিউনিস্ট পার্টির ভারতের মাটিতে প্রত্যক্ষত আত্মপ্রকাশ!

শ্রেণী-সচেতনা ও শ্রেণী-সংগ্রামের উজ্জ্বল শপথ নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও যাত্রা শুরু।

প্রখ্যাত জার্মান জীবনীকার এমিল লুডভিগ। জোশেফ স্তালিনের সংগে তাঁর এক সাক্ষাৎকারে স্তালিনের মন্তব্য: 'মার্ক্‌সীয় দর্শনের

চারিত্র্য গ্রন্থ এবং মার্কসের আরও অনেক রচনায় যা সব সময়েই সত্য —তা হল, মার্কসের মতে—জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে জনগণ স্বকপোল কল্পনা বা তাদের বুদ্ধিতে যেমন ভাবে এসেছে, ঠিক সেই মত নির্দেশেই তারা ইতিহাসের নির্মাতা হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি নতুন প্রজন্মই ইতিমধ্যে চালু আছে এমন কোন ব্যবস্থারই সম্মুখীন হয় তারা। সেই ব্যবস্থা ওই প্রজন্মের একেবারে জন্মকালেই তারা পেয়ে যায়।'

শ্রেণী-সচেতনা তাই হঠাৎ উদ্ভূত কোন সমাজ-ভাবনা বা ব্যবস্থা নয়, তার একটি নির্দিষ্ট সূত্র, ক্রম, বিকাশ ও পরিণতিমুখীন প্রবাহ আছে।

সুকান্তর আগে বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-ভাবনা এসেছে অতি অলক্ষ্যে, সন্তর্পিত ভাবনা-চিন্তায়।

ছন্দের মন ও মননের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত! 'মেথর', 'শূদ্র', 'জাতির পাঁতি,' 'বিশ্বকর্মা', 'পাল্কির গান', 'সাম্য-সাম' কবিতা মনে পড়ে তাঁর! প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনাথ যখন এদেশে ফরাসী কবি বোদ-লেয়ারের কবিতা অনুবাদে অভিনিবিষ্ট, তখন সারা ফরাসী দেশে চলেছে ফরাসী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবল ঝড়। সময় উনিশ শ সতেরো সাল। তাই শ্রেণী ভাবনার সচেতনা অলক্ষ্যে কবিমনে ছিল বৈকি! 'সাম্য-সাম'-এ কবির একাধিক তির্যক, ঋজু, বলিষ্ঠ প্রশ্ন : 'কে আছে আজিকে অবনতমুখে পীড়িত অত্যাচারে? / কে বা ক্ষুণ্ণ, কে বা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে? / যুগ যুগ ধরি কি করেছ মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা? / পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে দহিতে কারণ বিনা?' অন্যদিকে 'পাল্কির গানে' কবি পাল্কি-বেহারাদের দ্রুতগমন, ক্লান্তি, শ্রমকাতরতার কথা ভেবে যেন বা তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠ : 'বাঁধের দিকে সূর্য ঢলে / পাল্কি চলে রে, অঙ্গ ঢলে রে / * * ছয় বেহারা / জোয়ান তারা / গ্রাম ছাড়িয়ে / আগ বাড়িয়ে / নামল মাঠে / তামার টাটে / তপ্ত তামা / যায় না থামা'।

শ্রেণীর কথা, পরিশ্রমী মানুষের জন্য ভাবনা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

কবিতায়ও—এবং সেই সূত্রেই 'ভক্তি'কে বলেছেন—'প্রবলের সাথে একতরফা সে সন্ধি', বলেছেন—'দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধখানি', পৌরাণিক শিবের প্রতি তর্জনী শাসিত নির্দেশ—'থামাও তোমার পাগুলে নাচন / বেঁধে নাও জটাজুট, / হাতে ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া / প্রলয় শালায় গড়িয়া পিটিয়া / করে নাও হাল হয়েছে সকাল / ধরো লাঙলের মুঠ।' যারা সর্বরিক্ত চিরব্যথিত, উপেক্ষিত, তাদের জন্য বিখ্যাত প্রতীকে তাঁর প্রশ্ন—'চেরাপুঞ্জীর থেকে / একখানি মেঘ ধার দিতে পার / গোবি সাহারার বুকে ?' স্বভাবসিদ্ধ মানবতাবোধেই এমন কথা —'শুনহ মানুষ ভাই। / সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, / স্রষ্টা আছে বা নাই।' সেই বিখ্যাত প্রতীকী প্রয়োগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় শ্রম ও শ্রমিকদের প্রতিচিত্রণ : 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই, কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে, / শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে, আলগোছে ছেনি চুমে। / হেথায় হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি।' বস্তুত কবিরা ভালবাসেন মানুষকে। মানুষের দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা, রোমান্টিক ভাববিলাস এবং আত্মতৃপ্তি পরিচর্যার বিরুদ্ধে কবিদের ছিল ভয়ংকর ক্ষোভ ও উত্তেজনা, আঘাত করার অব্যবহিত শ্লেষ-নির্ভর প্রতিক্রিয়া!

মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়'-এ 'ভেঙে ফেল মঠ মন্দির চূড়া দারু শিলা কর নিমজ্জন'—এমন বজ্র নির্ঘোষেও সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীসচেতনার এক সুদূর দৃশ্য-ছবি ভেসে ওঠে যেন!

প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ 'ইন্‌স্‌টিংক্‌টিভ'-ভাবে এর পরিচয় আছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যেও। প্রমাণ—লেখকের সমকালের বাঙালীর ভীরুতাকে তীব্রভাবে আঘাত হানার মধ্যে। আছে 'পাদ্রী লং ও নীলদর্পণ' অধ্যায়ে নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি তাঁর তীব্র অন্তর্জ্বালা প্রকাশে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র 'মিউটিনি' অধ্যায়ে কালী প্রসন্নের চমৎকার মন্তব্য—'বাঙালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে 'যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালীই আচেন—বহুদিন বৃটিশ সহবাসে, বৃটিশ শিক্ষায় ও

বৃটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মতো হতে পারেন নি।' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য', 'বিড়াল' রচনায়, স্বামী বিবেকানন্দের 'ভুলিও না মুচি মেথর আমার ভাই' মন্তব্যে, শরৎচন্দ্রের 'যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই' তাদের সমগোত্রীয় হওয়ার আন্তরিক প্রয়াসে শ্রেণী-ভাবনা নিশ্চয়ই গভীর প্রোথিত।

রবীন্দ্রনাথের আঠারো শ তিরানব্বই-এ রচিত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়, পুনশ্চের 'শিশু তীর্থে', উনিশ শ বত্রিশে রচিত 'চণ্ডালিকা' নৃতনাট্যে, উনিশ ছত্রিশে রচিত 'প্রান্তিকে'র 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস' কবিতায়, 'জন্মদিন'-এ একটি শ্রেণীর হয়ে তীব্রকণ্ঠ প্রতিবাদী হওয়ার প্রয়াস নিশ্চয়ই উল্লেখ্য! আঠারো শা' তিরানব্বই-এর মধ্যেই সুদূর রোডেশিয়ায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। কালো চামড়ার লোকের শরীরে গরম আলকাতরা ঢেলে পুড়িয়ে মারার ঘটনা! যেমন বীভৎস, তেমনি মর্মান্তিক ও মানবতা-বিধ্বংসী। রবীন্দ্রনাথের লেখনী তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—'সেই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা / সেই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।' 'দুই বিঘা জমি' কবিতাতেও সেই শ্লেষাত্মক শ্রেণী-ভাবনা!

বিশ শতকে যদিও সেই 'ইনস্টিংকটিভ' ভাবেই প্রথম শ্রেণী-সচেতনা অনেক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হতে দেখি নজরুলের একাধিক কবিতায়—'কুলিমজুর', 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী'র কবিতায়—'মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান, / ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁদিতেছে শয়তান।' 'আমি সেইদিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না, / অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রনিবে না।' মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার সেই বিখ্যাত চরণ—'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, / মুটে মজুরের, / আমি কবি যত ইতরের। / আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের',।

সুকান্তর জন্মেরও আগে ও জন্ম-সম-সময়ে এবং সচেতনভাবে কাব্য রচনার কালে যে শ্রেণী-ভাবনা বা সচেতনা, তার উৎস মূলত বুদ্ধিজীবী কবিপ্রাণ লেখকদের তীব্র সহ-জ মানবপ্রেম। সমর সেন, বিষ্ণু দে,

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতায় যে সমাজ-সচেতনা ও তৎজাত-শ্রেণী-সচেতনা, তার সংগে সুকান্তর শ্রেণী-সচেতনার ভাব-সাযুজ্য লক্ষ্য করার মতো।

সুকান্তর শ্রেণী সচেতনা নিছক 'ইন্‌স্‌টিংকৃটিভ'-নির্ভর নয়, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত।

সুকান্ত কমিউনিস্ট কবি। কমিউনিজ্‌মের উৎস মুখেই থাকে শ্রেণীতত্ত্ব, শ্রেণীভাবনা, প্রয়োগে তা হয় শ্রেণী-সচেতনা। সুকান্তর আবাল্য শিক্ষা শ্রেণী-সচেতনার প্রথমে নিজ জীবন, সংসার পরিবেশে পরোক্ষে, সচেতনভাবে কমিউনিস্ট হওয়ার পর প্রত্যক্ষে। সুকান্ত স্বয়ং এক বুর্জোয়া পরিবারে লালিত মানুষ।

তত্ত্বগত অর্থে শ্রেণী-সচেতনার স্বরূপ কি ?

তত্ত্বের বিচারণায় শ্রেণী সৃজনের সূত্রের প্রধান তিনধারা—এক, 'ক্ল্যাসিক্যাল মেথড'-এ, দুই, সুপার স্ট্রাক্‌চার থেকে শ্রেণী গঠনে, তিন, মানুষের জাত থাকতেও বংশানুক্রমিক ব্যবসায় গ্রহণে।

আদিমতম পৃথিবীর আদিম অ-সভ্য মানুষের প্রসঙ্গে আসা যাক। বন্য প্রকৃতি-লালিত প্রাণীদের আছে ধারাল নখ-দাঁত। মানুষের তা অনুপস্থিত। তাই তার প্রথমেই প্রয়োজন হাতিয়ার। হাতিয়ার দিয়ে তারা তৈরী করতে চায় বাঁচার উপযোগী খাদ্য, বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করার উপযোগী উপযুক্ত অস্ত্র।

কিন্তু মানুষের আছে বুদ্ধি, বিবেক, শ্রমশক্তি। তা দিয়ে যা—তার প্রতিদিনের দিনযাপনের, প্রাণধারণের পক্ষে প্রয়োজন, তার বেশী উৎপাদন করে! প্রয়োজন মিটে গেলে শ্রমের বাড়তি অংশের ভোগী কে ?

এই জিজ্ঞাসা থেকেই গড়ে ওঠে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, জন্ম নেয় শ্রেণী ও শ্রেণীসচেতনা !

মানুষ-অবলম্বিত উৎপাদন-পদ্ধতির দুটি দিক—এক, উৎপাদন শক্তি, দুই, উৎপাদন সম্বন্ধ। উৎপাদন শক্তির জন্যে চাই শ্রম আর উৎপাদনের উপায়। উৎপাদনের অন্যতম উপায়, মানুষের হাতিয়ার অর্থাৎ যন্ত্র। এই যন্ত্র শ্রমের নির্ভরতায় আনে কাঁচা মাল—শ্রমের লক্ষ্য।

অন্যদিকে উৎপাদন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পত্তির সম্বন্ধের সংগে সমন্বিত হয়। আর আর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরেই শক্ত ভিত্তি পায় বাস্তব সমাজ। এই সমাজই এককালে আনে শ্রেণী বৈষম্য, তারই সূত্রে আসে শ্রেণীসচেতনা।

শ্রেণীসচেতনা মানবসভ্যতার ধারায় বস্তুত বুদ্ধির সচেতনা, চিরকালের মানবতার অধিকার অর্জনের সচেতনা!

আদিমকালের মানব বিবর্তনের ইতিহাস বলে—প্রথমে মানুষ হয় প্রকৃতিত, পরে হয় সমাজবদ্ধ; ক্রমশ সমাজ-মানুষ সমাজ ভেঙে দাঁড়ায় সর্বহারা শ্রেণীর শক্ত ভিত্তির ওপর।

একালের সভ্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীর মূল ভাগ দু'টি—এক, একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী, দুই, প্রোলেটারিয়েট—সর্বহারা শ্রেণী!

আর পৃথিবীর সমস্ত বুর্জোয়া দেশে শ্রেণীর বিন্যাস নানাভাবে—এক, কৃষকশ্রেণী, দুই, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী—ছোট ছোট কলকারখানা, দোকান-পাট-এর মালিক যে গোষ্ঠীর অংশীদার, তিন, ইন্টেলেজেন্সিয়া—বুদ্ধিজীবী শ্রেণী—অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক, ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ।

এমন সব শ্রেণীর শেষতম কথাটি যেনবা পাহাড়ের গাত্রে খোদিত লিপির মত, চিরন্তন বাণীর মত 'দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বাই মার্কস্ এ্যাণ্ড এঙ্গেল্স,-এ-'দি প্রোলেতারিয়ান্স্ হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট চেইন্স্। দে হ্যাভ এ ওয়ার্লড্ টু উইন।'—'সর্বহারাদের নিজেদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। জয় করার জন্য পড়ে আছে তাদের পৃথিবী।'

সুকান্ত যেহেতু কমিউনিস্ট বুঝিবা রক্তের আত্মীয়তায়, তাই তার শ্রেণীসচেতনা ছিল মার্কস্-এঙ্গেলসের শিক্ষায় শীলিত। আঠারো শ-ছিয়ানব্বই থেকে উনিশ শ ছত্রিশ সালের মধ্যবর্তীকালে পাই রাশিয়ান বোলশেভিক সোস্যালিস্ট কবি মায়কভ্স্কিকে! উনিশ শ ছত্রিশে বাংলাদেশের বোলশেভিক ডেমোক্র্যাট তরুণ কবি সুভায় মুখোপাধ্যায়কে পাই। সুকান্ত এঁদের অনুসারী।

কবিদের শ্রেণীসচেতনা নিশ্চয়ই তাঁদের সমাজ শিক্ষা, বাস্তববোধ ও অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই সংগে থাকে একান্ত ব্যক্তিমনের গভীর প্রভাব। তা না হলে একই 'মেঘ' দেখে একজন কবি কৃষকদের কথা ভেবে কাতর কণ্ঠ—'আল্লা মেঘ দে পানি দে/ফসল ফলে না', আর এক কবি রোমাটিক ভাববিলাসে সুদূরের পিয়াসী—'মন মোর মেঘের সঙ্গী/উড়ে চলে দূর দিগন্তের পানে/নিঃসীম শূন্যে।'—এমন সম্ভব হয় কি করে?

যেহেতু সুকান্তর ইতিহাস দর্শন এক কট্টর কমিউনিস্টের ইতিহাস দর্শন, যেহেতু সুকান্তর ইতিহাস-অভিজ্ঞতা এক রূঢ় বাস্তব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় দীপিত, তাই সুকান্তর কমিউনিজম্-পরিশীলনে পবিত্র কবি-আত্মা সম্যক উপলব্ধিতে উত্তপ্ত হয়েই বলে ওঠে—ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে ভবিষ্যতের দিন এখন শোষিত শ্রেণীর দিকেই! এবং সুকান্ত এমন তাৎপর্যের কথাটি বলে কবি-প্রাণের গভীরতম তলদেশ থেকে একমাত্র সাচ্চা কবিরই কথ্যভাষায়।

বস্তুত এটাই মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গি!

এমন সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থন মেলে আর্নল্ড ফিশারের সত্য-সন্ধানী মন্তব্যে—'দি নিউ সোস্যালিস্ট এ্যাটিচিউড ইজ দি রেজাণ্ট অফ দি রাইটার্-স্ অর আর্টিস্ট্‌স্ এ্যাডপ্‌টিং দি হিস্টোরিক্যাল ভিউ-পয়েণ্ট অফ্ দি ওয়ার্কিং ক্লাশ।' শুধু তা-ই নয়, 'ফিশার বলেছেন, এই ধরণের লেখকরা 'এ্যান্টিসিপেট্‌স্ দি ফিউচার!'

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম মন্ত্রীসভার অন্যতম সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন লুনাচার্‌স্কি!

লুনাচার্‌স্কির একটি মূল্যবান উক্তি এই প্রসঙ্গেই,—'হিয়ার দি বেসিক ক্রাইটেরিয়ান ইজ দি সেম এ্যাজ দ্যাট অফ প্রোলেতারিয়াল এথিক্‌স্ এভরি থিং দ্যাট এড্‌স্ দি ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাণ্ড ভিক্‌ট্‌রি অফ দি প্রোলেতারিয়েট্‌স্ ইজ্, গুড, এভরি থিং দ্যাট হার্ম্‌স্ ইট ইজ ইভিল।'

সুকান্ত, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষকর্মী ও পরে সক্রিয়

উল্লেখ্য সদস্য হওয়ার সময় থেকেই এই বিশ্বাসে কর্মজীবন ও কাব্যজীবনে আনে সমন্বয়।

কবিতা তারই বুঝিবা প্রত্যক্ষ দলিল। বুঝিবা কবি সুকান্তর উজ্জ্বল শ্রেণীসচেতনার মূল্যবান শ্বেতপত্র।

সুকান্তর আবেগধন্য কবিতাগুলির মধ্যেকার শ্রেণীসচেতনার নানান দিক্, পর্যায়, নানান বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মত। বেশ কিছু কবিতায় কবি একেবারে ঘনিষ্ঠ থেকেছে সর্বকালের সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে! যেমন —'চিল', 'ফসলের ডাক : ১৩৫১', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'কৃষকের গান', 'এই নবান্নে' ইত্যাদি।

কোন কোন কবিতায় কবি স্বয়ং বুঝিবা সর্বহারা শ্রেণী! সেখানে মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ক্রোধের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'বোধন' 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'পরিখা', 'চারাগাছ,' 'কলম', 'প্রার্থী', 'সিঁড়ি', 'আগ্নেয়গিরি',—এমন সব কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে।

আবার 'রানার', 'বিবৃতি', 'লেনিন', 'ঠিকানা'—এমন কিছু কবিতা পড়ার শেষেই সহৃদয় পাঠকের এ বিশ্বাস আসে, কবি সুকান্ত এমন কবিতাও রচনা করেছেন, যেগুলির মধ্যে নেই প্রতিবাদ, বিদ্রোহের ঝাঁঝ, অথচ ওতপ্রোত আছে সর্বহারা শ্রেণীর গভীর-গম্ভীর বৃহত্তম আশাবাদের কথা।

কবি সুকান্তর ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান কিরকম? শ্রেণী-সচেতনায় উজ্জ্বল কোন কোন কবিতায় তার উত্তর মেলে। সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর হয়ে কবি তাদের দিকে দাঁড়িয়ে। বিপরীত কোটিতে আছে মালিকপক্ষ। মাঝখানে মালিকপক্ষের উমেদার বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়াদের ঘৃণ্য তৎপরতা। উদাহরণ—'মজুরদের ঝড়' কবিতা।

কয়েকটি শ্রেণী সচেতনা-আশ্রিত কবিতায় আছে সর্বহারা শ্রেণীতত্ত্বের নিপুণ টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য! দৃষ্টান্ত—'ছাড়পত্র', 'আগামী', '১লা মে-র কবিতা '৪৬', 'খবর', 'প্রস্তুত', 'জাগবার দিন আজ' ইত্যাদি।

কখনো কখনো সুকান্ত তার শ্রেণীভাবনাকে বিবিধ বিচিত্র ভাবনা, সময়-চেতনা ও সময়-পরিবেশের সংগে গভীরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' নামের বিখ্যাত কবিতাটিই এর অন্যতম প্রমাণ !

'চিল' কবিতায় সুকান্ত উপসংহারে এসে স্পষ্ট করে তার সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে থাকার ছবি। 'চিল' কবিতার জন্ম যুদ্ধাঙ্গনে মুসোলিনির শোচনীয় পরাজয়, পতন ও মৃত্যুর কথা ভেবেই ! মুসোলিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের বর্বর ফ্যাসিজম্-এর অন্যতম প্রবক্তা !

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত-এক উদ্ধত চিলকে।

'চিল' তো ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির তথা সমগ্র ফ্যাসিজিম্-এর প্রতীক। মৃত চিলের দিকে নির্ভয়ে যারা এগিয়ে গেল, তাদের মধ্যে তাদেরই মতো স্বয়ং কবিকেও যেন দেখি ! তাদের ঘৃণা, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য—সবই যেন কবির নিজেরই অন্তরের ছবি। এক কমিউনিস্ট কবির শ্রেণী সচেতনা এখানে ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত !

'ফসলের ডাক : ১৩৫১' কবিতায় কবি যখন সোচ্চার হয়—

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর
যে কাস্তে,ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ থেকে সুকান্তর সচেতন শ্রেণী ভাবনার আর একরূপ। ভারত তখন বৃটিশ শাসকদের উপনিবেশ। এমন কঠিন শাসনে তটস্থ উপনিবেশে ভারতবাসীর যে দেশপ্রেমের জাগরণ, তা তো উগ্র হতে বাধ্য ! সেই উগ্রতা একদিকে শাসক-শোষক—যারা বিদেশী, আর একদিকে শাসিত-শোষিত—যারা সব-দেশী, এই দুই শ্রেণীর জন্যই সুকান্তর 'দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর'-এর আর্ত আকাঙ্ক্ষা !

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে থেকে তাদের অসহনীয় অসহায়তাকে নিয়ে মালিক শ্রেণীর প্রতি তীব্রতম

ব্যঙ্গ নিক্ষেপের কাব্যিক রসমূর্তি আছে ছোটগল্পের আকস্মিকতায় অথচ অবধারিত, একেবারে পাঠকের মর্মে গিয়ে আঘাত-হানার ভয়ংকরতায়—
'অবশ্য খাবার খেতে নয়-খাবার হিসেবে'।

সুকান্ত 'বোধন' কবিতায় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় কারা কোন্ শ্রেণীর !

শোন রে মালিক শোন রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার ?

এখানে 'মজুতদার' আর 'মৃত মানুষের হাড়' তুই শ্রেণীর প্রতিভূ ! সুকান্ত মৃত মানুষদের মধ্যে নিজেকে স্থির বসিয়েই চিহ্নিত করে বিরুদ্ধ শ্রেণী-প্রতিপক্ষকে। সেই বিদ্রোহে, ক্রোধে ঘোষণা করে—

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই !
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

'তুই' সম্বোধন করে তীব্র ঘৃণা, তাচ্ছিল্য প্রকাশের এমন ভাষার কাব্যিকতা কমিউনিস্ট কবির পক্ষে সম্পূর্ণ যথার্থ।

'সিগারেট' কবিতার শেষে সুকান্ত স্বয়ং যেন সিগারেট হয়ে বলে ওঠে—

হঠাৎ নিঃশব্দে জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল।

চরণ গুলির প্রতিটি শব্দে কবির ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ উত্তপ্ত আগুনের মত লক্ষ্য-নিদিষ্ট স্থির থাকে !

'দেশলাই কাঠি' কবিতায় কবি ঠিক নিজের আশ্রয়ে দাঁড়িয়েই বলে ওঠে—

তোমরা তো জান না
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই শেষবারের মত।

এ যেন নিজেই সর্বহারা শ্রেণীর হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি সাবধান বাণীর বোধনমন্ত্র।

শ্রেণী সচেতনায় সুকান্ত ছিল আশাবাদী। কিন্তু আশাবাদ কখনো নিছক মিছিলের শ্লোগান হয়নি, হয়নি চীৎকার-সর্বস্ব সমবেত জনতার দাবি-দাওয়া মাত্র! বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা দিয়ে বার বার কবি উত্তর অন্বেষায় তৎপর এবং একদিন যে তার উত্তর মিলবে, এই প্রবুদ্ধ প্রত্যয়েই কবি লেখে—

> রানার! রানার!
> এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে,
> রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?

এক রানারের অক্লান্ত শ্রমের, ঘর্মের, মর্মের বেদনা-বাণীর মধ্যে বার বার শেষতম আশাবাণী শোনে কবি। ডাক দিয়ে যায় যে, সেই রানার তো একটা খেটে খাওয়া মানুষের শ্রেণী!

এমন শ্রেণীর সচেতন আশার কথাতেই 'বিবৃতি' কবিতায় কবি নির্দ্বিধায় বলে ওঠে,

> রক্তে আনো লাল,
> রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

'মজুরদের ঝড়' কবিতায় আর এক শ্রেণী-সচেতনার চিত্র। একদিকে মালিক শ্রেণী, আর একদিকে মজুর শ্রেণী, একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত! আর মধ্যে? মালিক শ্রেণীর অর্থের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টির দালাল—বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর কিছু ক্ষয়িত মানুষ। এই শ্রেণীর জন্ম বাংলাদেশে, বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের মধ্যেই! তাদের স্বরূপ কি?

> এখন এই তো সময়—
> কই? কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘট ভাঙা দালালরা
> সেই সব দালালরা—
> ছেলেদের চোখের মত যাদের ভোল বদলায়
> বেরিয়ে এসো।

যেখানে কমিউনিস্ট সুকান্তর শ্রেণী-সচেতনা, সক্রিয় কর্মীসত্তা প্রখর, সেখানে সুকান্তর কবিসত্তা পোস্টারের কবিতার ভাষায় কথা বলে ওঠে। কবিতা সেখানে নিছক প্রয়োজনের, কবিতা শুধুমাত্র বোঝাবার, কবিতা শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ভাষা-জানাবার মাধ্যম!

বেরিয়ে এসো।
বেরিয়ে এসো শক্তিমান আর অর্থলোভীর দল।
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা।

এসব চরণে সুকান্তর শ্রেণীসচেতনা একজন কবির নয়, একজন শ্রেণীসচেতন কমিউনিস্ট কর্মীর!

এমন শ্রেণী-সচেতনার তত্ত্বকথা, তত্ত্বনির্দেশকে সুকান্ত কবিতা থেকে বর্জন করেনি, করতে পারেনি! কবির বিখ্যাত কবিতা 'ছাড়পত্র'। এখানে কবি লেখে—

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,

এখানে এই শিশু সর্বহারা শ্রেণীর প্রতীক।

সুকান্ত সর্বহারা শ্রেণীতত্ত্বকে নিজের হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে লালিত করে সর্বহারা তত্ত্বের বিকাশ, ঐতিহাসিক ভিত্তি ও পরিণতির কথা ভেবে বলে ওঠে—

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস॥

'১লা মে-র কবিতা '৪৬'-এ কবি স্পষ্টত সর্বহারা শ্রেণীতত্ত্বের টীকাকার যেন! তত্ত্বের প্রয়োগও হয়ে ওঠে কবিতা!

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের।
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্যের
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥

'জাগবার দিন আজ' কবিতায় শ্রেণীসচেতনার প্রয়োগে কৌশলগত তত্ত্বভাবনা—

পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই একসংগে।

'আগামী' কবিতায় সেই তত্ত্বেরই কাব্যরূপ—

আগামী-বসন্তে জেনো মিশে যাবো; বৃহতের দলে—
* * *
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,

সময়-চেতনা ও সময়-পরিবেশের সংগে মিশ্রিত শ্রেণী সচেতনায় সুকান্ত কখনো অজ্ঞাতে, কখনো বা অবলীলায় শ্রেণী ভাবনাকে রূপ দিয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে ভেবেই কবির স্মৃতি-তর্পণ, কিন্তু স্মৃতির সূত্রে শুধু জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কবিই থাকেননি, থেকে গেছে ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুব্ধ, পর্যুদস্ত এক বাঙালী তথা ভারতবাসীর শ্রেণী সমন্বিত দুঃখ চিন্তা—

আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

বস্তুত সুকান্তর কবিতায় শ্রেণীসচেতনার বিষয়টি তার সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই! কর্ণের কবচকুণ্ডল কর্ণকে দুই শক্তিতে ধরে রেখেছিল—একদিকে কানীন পুত্রের সত্তা, আর একদিকে পাণ্ডবকুলের ভ্রাতৃসম্বন্ধের সত্তা। সুকান্তর শ্রেণীসচেতনা তেমনি দুই রূপে এক—কমিউনিস্ট এবং কবি—দুয়ে এক-সুকান্ত!

নবম অধ্যায়

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু আর ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যবর্তী কাল।

উনিশ শ উনচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ সাল।

বাংলাদেশ তথা কলকাতা যেনএক দ্রুত ঘূর্ণায়মান আলো আঁধারির রঙ্গমঞ্চ!

কলকাতা, সারা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ। অতি দ্রুত পট পরিবর্তনের কাল!

মঞ্চের বৃত্তাকারে দ্রুতগতির সংগে সংগে একাধিক বিচিত্র ও মিশ্রিত আলোর সম্পাত কলকাতার রঙ্গমঞ্চে!

সেই মঞ্চে একা একা কবি সুকান্ত—সব্যসাচী কবি। এক হাতে রাজনীতির রক্ত-পতাকা, আর এক হাতে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত কবির লেখনী!

এক উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহী-কবি-নায়ক—সুকান্ত!

যেন আধুনিকোত্তম এক সজ্জিত মঞ্চে এক আধুনিকোত্তম কবি!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু'টি পূর্ণ দশকের বাংলা কাব্যজগত এক বিশেষ অর্থে অনুর্বরার অভিশাপে মন্থর গতি! অনুর্বরা অর্থ নূতন-চেতনা, যুগ, শিল্প-মাত্রা সৃষ্টির পক্ষে।

এই দুই দশকের কবিকুলে ছিল ম্লান মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনা, ছিল সংশয় আর নৈরাশ্য, ছিল শ্লেষ ও ব্যঙ্গকে একমাত্র ভিত্তি করে একধরণের 'নেগেটিভ' কাব্য-পরিবেশ রচনার প্রয়াস।

সুকান্ত নদীর এপারে এক ইতিবাদী জীবনচেতনায় দীপ্ত কবি-পুরুষ তখন। নতুন যাত্রা তার, নতুন শপথ।

এই শপথ বিদ্রোহের, বিপ্লবের, গণবিক্ষোভকে যথাযথ আত্মিক সংকটের সূত্রে চিত্রিত করার।

কাব্যের রঙ্গমঞ্চে সুকান্ত যেনবা মহাভারতের সেই অসম্ভব ক্ষমতাবান অভিমন্যু! তার চারপাশে সপ্তরথীর তীর নিক্ষেপ!

বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসুরিক উল্লাস ও পদবিক্ষেপ!

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তেরশ উনপঞ্চাশে মাতাল রুদ্রের বেশে ঝড়!

মানুষের তৈরী-করা মন্বন্তর, মহামারী, হাহাকার!

হিটলারী ফ্যাসিবাদের রক্তচক্ষুর শাসন!

দালাল, মুনাফাবাজ, মজুতদারদের জন্ম!

কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমানে নির্লজ্জ দাঙ্গা!

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে কৃষক-মজুরদের ওপর উৎপীড়ন, অত্যাচার, তাদের সর্বশক্তিকে দেশের বিভীষণদের সহায়তায় নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস!

এই হল সাতটি অশুভ রথীর পরিবেশে মঞ্চে অভিমন্যু সুকান্ত!

মঞ্চে কবি-সুকান্তর প্রবেশ দৃপ্তভঙ্গিতে, কণ্ঠে সবল ঘোষণা—

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে।'

এমন পরিবেশে সুকান্তর কবিতায় একেবারে ঝর্ণার জলের মত সহজ, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত অথচ নির্মম হয়ে দেখা দেয় তিনটি ভাবনা—

বিদ্রোহ, বিপ্লব আর গণবিক্ষোভ!

কবি সুকান্তর কিশোর মনের পৌরুষদীপ্তিই ছিল এর মূল চাবি-কাঠি! তার মধ্যে সম্পৃক্ত কবির ইতিহাস-সচেতনা, সমস্ত রকম সামাজিক ও জৈবনিক গ্লানি ও কুশ্রীতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত ব্যঙ্গের ঝলক, সমস্ত হতাশার বিপরীতে প্রোজ্জ্বল আশা, গভীর প্রত্যয়-মুগ্ধ মানবিক আবেগ, কঠোর আত্ম-সমালোচনা, নিছক ব্যক্তিক মন ও মননের খেলা নয় পরিপার্শ্বকে আত্মগত করে নিয়ে এই সমাজ-নির্ভরতা, দেশজ কাব্যের ভিত্তিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার কঠিন বাসনা, আর কাব্যের শৈল্পিক দেহ-পরিশীলন প্রয়াস!

সুকান্তর কালেই অগ্রজ কবি নজরুলের কণ্ঠে ছিল বিদ্রোহের গান।

সেই গানে সারাদেশ তখন নন্দিত! নজরুল সে সময়ে এবং আজও তাই 'বিদ্রোহী কবি' অভিধায় সম্মানিত।

কিন্তু সুকান্ত!

শুধুই কি কিশোর কবি?

না। কবি সুকান্ত এমন কবি, যার কাব্যে আছে এক কিশোর পুরুষ।

বোধ হয় এতেও সুকান্তকে তার অমর স্থানে বসাবার মত যোগ্য অলংকার হয় না!

শুধুমাত্র বিদ্রোহী কবি নয়, সুকান্ত বিদ্রোহী আত্মার কবি!

রাজনীতির সংগে জড়িত ছিল বলেই যে সুকান্তর কবিতায় বিদ্রোহ এসেছে, তা ভুল। বিদ্রোহ তার কবি-আত্মার আলো, তার শরীরী উপস্থিতির সংগে তার ছায়া। সুকান্তর কবিতায় তার বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণবিক্ষোভের চেতনা আত্মার থেকে নিঃসৃত পবিত্র আলোর মত!

জোয়ান অব আর্ক নির্জন স্থানে যে অপূর্ব আলোর প্রতিসরণ প্রত্যক্ষ করে, যে আলোর বিশ্বাসে হয় দীপিত, কবি সুকান্তর কবি-পুরুষে সেই আলোর বিচ্ছুরণ, কবি আত্মায় তারই স্বতঃস্ফূর্ত স্থিতি।

সুকান্তর কবিতায় বিদ্রোহ, বিপ্লব আত্মার যন্ত্রণানিষিক্ত আলোর বন্যায় স্পষ্ট ও সত্য বলেই কবি সুকান্ত বিদ্রোহী আত্মার কবি!

প্রমাণ—প্রতীকী কবিতা 'কলম', 'আগ্নেয়গিরি', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'লেনিন', 'আঠারো বছর বয়স'—এমন সব কবিতার অভ্যন্তরে আছে, তেমনি কবিতার বাহির ভিতর মিলিয়ে আছে 'বিদ্রোহের গান,' 'শত্রু এক', 'চট্টগ্রাম: ১৯৪৩' '১লা মের কবিতা: ৪৬', 'অনুভব / ১৯৪৬', 'কাশ্মীর', আনন্ত্যোপায়', 'ফসলের ডাক: ১৩৫১', 'কৃষকের গান', 'ছাড়পত্র', 'উদ্বীক্ষণ', 'সেপ্টেম্বর' ৪৬,' 'মজুরদের ঝড়', 'ডাক', 'মৃত্যুময়ী গান', 'বিক্ষোভ', 'ঐতিহাসিক;' 'বিবৃতি', 'পরিখা', 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী'র মত একাধিক কবিতায়।

এই সব কবিতার বিষয়ে আছে ফ্যাসি শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিলিপ্সু জনগণের সংগ্রামের কথা, সব রকমের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গণ-

অভ্যুত্থানের চিত্র, আছে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের জন্য নতুন যুগ গঠন করার উপযোগী সংগঠন ভাবনা। আরও আছে মজুতদার ও মিল মালিকদের হৃদয়হীন বর্বরতা, নির্লজ্জ লোভ-লালসার, অর্থগৃধ্নুতার দিককে প্রতিবাদী সততায় উলঙ্গ করে সমস্ত মানুষের কাছে স্পষ্ট করে রাখার প্রয়াস।

'কলম' কবিতায় আছে কলমের বকলমে বিদ্রোহের শিক্ষা, মন্ত্রোচ্চারণ! কলমের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে নিপুণভাবে বর্ণনা করে, তার ছায়ায় অর্থাৎ তারই স্বভাবের ভিতরে প্রতি-স্বভাবে সুকান্ত এনেছে ইতিহাসের শিক্ষা। কলমের যে কর্মতৎপরতা, যে শ্রম, যে সভ্যতাকে গঠন করার শক্তি, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুকান্তর যে আকূতি, সে তো বিদ্রোহ-চকিত!

কলম, তুমি চেষ্টা কর, দাঁড়াতে পার কিনা।

*　　　*　　　*

*　　　*　　　*

এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর--কাজ।

*　　　*　　　*

বিদ্রোহ দেখনি তুমি? রক্তে কিছু পাওনি শেখার?

এমন সব প্রশ্নের 'নেগেশান'-এ আছে প্রত্যয়সিদ্ধ 'এ্যাফারমেশান্'। সে 'এ্যাফারমেশান' বিদ্রোহের শিক্ষার, স্বীকৃতির, সিদ্ধান্তের!

—কলম! বিদ্রোহ আজ, দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁক,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;

সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবির অস্থিরতা, আর্তি আছে কবিতার শেষতম সিদ্ধান্তে—

কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম
আনো দিকে দিকে॥

সুকান্তর সমকালে ধর্মঘট ছিল প্রতিদিনের এক প্রয়োজনীয় বস্তুর মত। সেই ধর্মঘটের সংগে বিদ্রোহের যোগ নিবিড়তম। ছোট ছোট ধর্মঘট বড় বড় বিদ্রোহ আর বিপ্লবের জন্মদাতা!

কবি সুকান্তর কবি-পুরুষ বার বার বিদ্রোহকে আলিঙ্গন করার, অভিনন্দিত করার, সূর্যের মত প্রত্যক্ষ করার সুতীব্র বাসনাতেই প্রথম আঁকে আগ্নেয়-গিরির বাহির-ভিতরের ছবি—

আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো!
চোখে আমার বহুদিনের তন্দ্রা

আর সবশেষে একটি যেন দেওয়ালপঞ্জীতে নির্দিষ্ট লাল তারিখের জন্য প্রতীক্ষা—

আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি॥

কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তো বিনা রক্তপাতে সফল হয় না। শরীরের দূষিত রক্ত বের হয়ে গেলে তবেই তো শরীর সুস্থ, সবল, সতেজ ও সপ্রাণ হয়! বিদ্রোহের ধর্মও তা-ই। রক্তপাতে তার গায়ের রঙ লাল। রক্তের শপথে সব বিদ্রোহই গতিপ্রাণ! জালিয়ানওয়ালাবাগ, জালালাবাদ আর কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীট! সুকান্তর কালের এইসব স্থান বিদ্রোহের আগুনে ছিল লেলিহান!

কবি কি তখন বিদ্রোহের কথা বলতে বসে ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ! লেখনী হাতে কবি কি তখন পাখার হাওয়ার নীচে বসে রোমান্টিক বিদ্রোহ ভাবনায় মশগুল? শুধু রেডিও আর খবরের কাগজেই তার বিদ্রোহ-স্বাদ গ্রহণ?

না, কবি সুকান্তর ঠিকানা তো অন্য সব কবির মত নয়! বাইরে, বাংলাদেশে তথা সারা ভারত জুড়ে এমন সবল বিদ্রোহের ঘোষণা, তৎপরতা! কবি সুকান্তকে কোথায় পাব? কি তার ঠিকানা? সুকান্ত বিদ্রোহীর রক্তকণিকায় উদ্বেল হয়ে জানায় সেই ঠিকানা—

জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,

জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এ দেশে রক্তের অক্ষরে ॥

যেখানেই বিদ্রোহ, সেখানেই সুকান্ত। কবি সুকান্তর ও ব্যক্তি সুকান্তর যৌথ একটিমাত্র আত্মার আর এক নাম বিদ্রোহ।

সুকান্তর কবিতা বিদ্রোহের দলিল। যে কোন ঐতিহাসিক বিদ্রোহের ইতিহাস একেবারে উত্তপ্ত রসের ভিয়েনে সুকান্তর কবিতাতেই লভ্য। সুকান্ত সে বিষয়ে নিজেই প্রচারক 'অনুভব / ১৯৪৬' কবিতায়—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ,

এমন বিদ্রোহের দিন-পঞ্জিকা লেখার কারণ কি? কারণ—

নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।

*　　　*　　　*

তাই তো চলেছি দিন পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ।।

'কাশ্মীর'কে বিদ্রোহের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবি যখন আঁকে, তখন শুধু কাশ্মীরের কাল, স্বভাব, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কথা সত্য হয় না, সেই সংগে সুকান্তর কল্পনায় বিদ্রোহ কি রকম, তার জীবন্ত রূপ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা—
কাশ্মীর আজ চঞ্চল-স্রোত লক্ষ;
দিগ্‌দিগন্তে ছুটে ছুটে চলে দুর্বার
দুঃসহ ক্রোধে ফুলে ফুলে ওঠে বক্ষ।

'সিগারেটে'র প্রতীকেও সেই দুর্বার দুঃসহ ক্রোধের প্রকাশ—

আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে
আঙুলে আর পকেটে ;

*　　*　　*

নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বড়ি শুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল

শেষতম চরণ দু'টি যেন সিগারেটের তামাকের সহজাত ঘ্রাণের মত কবি সুকান্তরই জীবন্ত অস্তিত্ব !

'দেশলাই কাঠি'-র মধ্যেও কবি স্বয়ং উপস্থিত। সিগারেট জ্বালতে লাগে দেশলাই-কাঠি। ধনিক ধূমপায়ীর দুটিই প্রয়োজন। অর্থাৎ এরা সবাই ধনিকশ্রেণীর সর্ববিধ প্রয়োজনের অক্লান্ত যোগানদার শ্রমিক, মেহনতী মানুষ। সুকান্ত একে একে যেনবা প্রতিটি শ্রমিকের অন্তরের মধ্যে বসে থেকে বিদ্রোহের বাষ্প ছড়িয়েছে, বিদ্রোহের শিক্ষা দিয়েছে, তা না হলে 'দেশলাই কাঠি' কবিতার শেষ তিনটি চরণে এমন আন্তরিক চাপা বিদ্রোহের কথা ধ্বনিত হত না—

কিন্তু তোমরা তো জানো না :
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষবারের মতো ॥

এ কি সমবেত বিদ্রোহীদের পক্ষে এককণ্ঠে সাবধানবাণী, শাসনবাণী, না বিদ্রোহ বাণী ?

'শত্রু এক' কবিতায় কবির বিদ্রোহ-ভাবনা সাম্যবাদী ভাবনায় একাকার। বিপন্ন দেশের জন্য কবির স্বদেশ-প্রেমিক চেতনা ঠিক সময়েই উদ্দীপ্ত। সেই উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেমে কবিকণ্ঠের স্বীকৃতি—

আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,

এমন লাল পথের প্রতীক ব্যবহার সাম্যবাদী বিশ্বাসেরই ফল। এই সাম্যবাদী বিশ্বাসেই সুকান্তর কবিতায় বিদ্রোহ হয়েছে প্রতি-যুদ্ধ।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী যে যুদ্ধ, সুকান্তর কবিতায় তারই বিরুদ্ধে এক প্রতি-যুদ্ধ ঘোষণা ! এই যুদ্ধ বিদ্রোহের, বিদ্রোহী প্রাণেরই নামান্তর মাত্র।

বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘোষণা,
সে যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা—
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।

যে কোন সাচ্চা কম্যুনিস্টের কাছে, সে কবিই হোক বা কর্মীই হোক —লাল রঙ হল বিদ্রোহের উদ্রেককারী আকর্ষণ। সুকান্ত কর্মী-কবি তার দৃষ্টিতে তাই 'লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা !'

বিদ্রোহে দীপ্ত প্রাণবন্ত হওয়ার বয়স বুঝিবা আঠারো। এই আঠারো বছর বয়স সমস্ত ভীরুতা, সংশয় কাপুরুষতাকে 'হেলায় তুচ্ছ করে' নতুন জীবনকে বরণ করতে আগ্রহী হয়। বিদ্রোহ বয়সের, কিন্তু সেই বিদ্রোহী বয়সেরই সার্থক বন্দনা রূপ গীত হয়েছে সুকান্তর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়—

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ।।

সুকান্তর সমস্ত কবিতাই কমবেশী স্ব-কালের বিদ্রোহের দলিল। প্রমাণ আছে '১লা-মের কবিতা '৪৬'-এর মধ্যেও। এ কবিতায় বিদ্রোহের প্রতীক আছে 'লাল আগুন', 'তাজারক্ত', 'লাল আগুনে ঝলসানো খাদ্য', 'সিংহের কেশর'—এমন সব শব্দ ও শব্দগুচ্ছে। সুকান্ত যখন ভয়ংকর রাগে বলে ওঠে—

পোষ মানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।

শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে ॥

তখন সমস্ত অমানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ, স্বরূপ ও প্রাপ্তির পরিমাণ কি হবে, তা সহজেই স্বভাবী পাঠক-হৃদয়ে অধিগত হয়ে যায়।

'সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে।'

'পরিখা' কবিতার এই শেষতম চরণের যে ব্যঞ্জনা—তা বিদ্রোহী সুকান্তের একান্ত নিজস্ব নির্দেশ যেন বা!

'বিদ্রোহের গান' কবিতায় কবির দুর্দান্ত সাহসের সংগে বলশালী প্রতিপক্ষকে অবহেলা, অস্বীকার করার মধ্যে আছে বিদ্রোহের শপথ—

রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়াইতে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

দেশের মানুষের অন্নহীনতার বিবর্ণ রূপ দেখে কবির এমন স্পষ্টোক্তি বিদ্রোহেরই প্রতিরূপ।

সর্বরকম খ্যাতি-অখ্যাতির ঊর্ধ্বে কবি সুকান্ত। তাই খ্যাতির মোহ তাকে মুঠোয় আনতে পারে না। তার কর্মজীবনে চাওয়া আর কাব্য জীবনে চাওয়া—দুয়ের মধ্যে আছে সামঞ্জস্য। গীতায় যে কথা আছে, কাজ করে যাও, ফলের জন্য ভেবো না—সেই বিশ্বাস মাত্র গ্রন্থ পাঠ করে সুকান্ত গ্রহণ করেনি, কাজ দিয়ে নিজের করে। কবিতায় তাই এমন শক্তিমান বিদ্রোহাত্মক বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ানো!

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খল দড়ি,
মৃত্যুপণ।
দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,

রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে

পূর্ব কোণ।

সুকান্তর এই বিদ্রোহ চেতনায় আছে স্থির-নির্দিষ্ট বিশ্বাস, আছে লক্ষ্য, আছে লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। সমস্ত রকম দাসত্বের বিরুদ্ধে সুকান্তর আপোষহীন সংগ্রাম!

ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোন খানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ!

সবল বিদ্রোহের উন্মাদনায় কবি যে মৃত সতীদেহ কাঁধে ভয়ংকররূপী রুদ্রের মত উন্মত্ত অথচ স্থিত-প্রতিজ্ঞ, অনন্যোপায়, কবিতাটির নামে এবং কবিতার পরিণামী শেষ দুই চরণে তার সুন্দর স্বীকৃতি—

তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে॥

কবির মনে যেটা প্রতিশোধ স্পৃহা, সেটাই নেয় বিদ্রোহের রূপ। প্রতিশোধ স্পৃহা নিছক এই শব্দের সীমায় বাঁধা নয়, তার অর্থ-ব্যঞ্জনা চিরকালের মানবিক ব্যঞ্জনায়, চিরকালের শহীদদের সম্মানদানেই উচ্চকিত। কবি যে 'হাজার হাজার শহীদ ও বীর'-দের 'স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর' করে রেখে তাদের আত্মবিসর্জনের মহিমা ভোলেনি, তা 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎ বাণী' কবিতার বিদ্রোহের শপথেই সোচ্চার!

জনসংঘের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন—
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!

এমন প্রতিশোধের জন্যই কবির প্রতীক্ষা—

কবে আমাদের প্রাণ কোলাহলে—
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেসে যাবে কারাগার!

কবিতাটির সব শেষের দু'টি চরণ সুকান্তর বিদ্রোহের প্রক্রিয়া এবং ফলশ্রুতিই, অর্থাৎ কবির লক্ষ্য বস্তু দুইকেই স্পষ্ট করে—

রক্তের বিনিময় হয় হোক—
আমরা ওদের চাই ॥

ছোট ছোট বহু বিদ্রোহই ইতিহাসে চিহ্নিত করে বিপ্লবকে। বিপ্লব হল পরিবর্তন।

'জল, বরফ আর বাষ্প—তিনটি একই পদার্থের তিন রূপ। কিন্তু তিনটি রূপের চরিত্রে আমূল পার্থক্য। জল ঠাণ্ডা হলে বরফ হয়। এই ঠাণ্ডা হওয়া নিশ্চয়ই সময় সাপেক্ষ। কিন্তু জলের এই ঠাণ্ডা হওয়াটা জলের চরিত্রের ক্রমশ পরিবর্তনেরই রূপ। যত ঠাণ্ডাই হোক, জলটা জলই থাকে। জল, ঠাণ্ডা জল, আরো ঠাণ্ডা জল—এইটুকু মাত্র পরিবর্তন। কিন্তু ঠাণ্ডা হতে হতে হঠাৎ একটি মুহূর্ত আসে যখন জলটা আমাদের চোখে আর জল থাকে না, বরফ হয়ে যায়—আমাদের কাছে জলের চরিত্রই পালটে যায়। এই যে পরিবর্তনের মুহূর্ত, যখন পদার্থটির চরিত্র আমূল পালটে গেল আমাদের কাছে, এই মুহূর্তকেই বলে বৈপ্লবিক মুহূর্ত, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলে 'বিপ্লব'। তেমনি জল গরম হতে হতে একটা মুহূর্তে বাষ্প হয়ে যায়, জলের চরিত্রে আর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়।' (বিপ্লবের কথা / নিত্যপ্রিয় ঘোষ)

সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি—একটি দেশের বা রাষ্ট্রের এমন যে কোন অংশে দেখা দিতে পারে বিপ্লব।

সুকান্ত কবিতা লেখে বাংলাদেশের প্রবল রাজনৈতিক বিপ্লবের কালে, সুনির্দিষ্ট শ্রেণীচিহ্নিত সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে। একসময়ের সমাজ-রূপান্তরে দেখা দেয় বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রমিকের প্রভু যখন হয় এই মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, অর্থাৎ সামন্ত শ্রেণীর থেকে রাষ্ট্র যন্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বুর্জোয়ারা যখন তা দখল করে, তখনি হয় বুর্জোয়া বিপ্লব। আবার বুর্জোয়াদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যখন শ্রমিকদের পক্ষে ঘটে রাষ্ট্রযন্ত্র গ্রহণ, তখনি তার নাম হয় শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব।

এরই আর এক নাম 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'।

সুকান্ত ভারত তথা বাংলাদেশে সাম্যবাদী চেতনায় দীপিত এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিল তার দলের কাছে, কবি-আত্মায় ছিল মানববাদের দীক্ষা।

এই দুই মিলে সুকান্তর কবিচেতনায় ছোট ছোট বিদ্রোহ ভাবনা থেকে যে বড় বিপ্লব চেতনা কাব্যময় হয়, তা এক ঐতিহাসিক সত্য, ঐতিহাসিক দলিলও।

সুকান্তর কালে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সত্য রূপ ছিল রাশিয়ায়। লেনিন তার প্রবক্তা। মার্কস্, এঙ্গেল্সের তত্ত্বের সজীব ভাষ্যরূপ রাশিয়ায় তথা বিশ্বের বলিষ্ঠ নেতা ভি. আই. লেনিন। তাঁর আদর্শ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রে সুকান্তর কবি-দৃষ্টির সামনে ভোরের ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল এবং নিকটবর্তী।

সুকান্তর কবিতায় সেই বিপ্লবের জন্য আকাঙ্ক্ষা, আর্তি, স্বপ্ন, কল্পনা, বিশ্বাস।

'লেনিন' কবিতায় কবি বিশ্ব-বিপ্লবের রূপ আঁকে মাত্র দু'টি চরণে—

> বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
> —আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

সেই জল থেকে একসময়ে হঠাৎ বাষ্পে রূপান্তর গ্রহণের মুহূর্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবলুপ্তি আর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্মযন্ত্রণা—দু'য়ের মধ্যবর্তী কাল! যথার্থ বিপ্লব সংঘটনের কাল!

এমন বিপ্লবের স্বরূপ কি ?

> বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
> দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
> দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
> আজো যায় শোনা,
> দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।

সুকান্ত শুধুমাত্র বিদ্রোহী হতে চায় না, নিরন্তর বিদ্রোহের মধ্যেই প্রাণচেতনাকে ব্যস্ত রাখতে চায় না, চায় 'আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের

প্রত্যেক আকাশে' লেনিনের মত বিপ্লবী হয়ে পৃথিবীকে সুস্থ সবল মানসিকতায় দীপিত করতে!

রাশিয়ায় লেনিনের বিদ্রোহী নেতৃত্ব শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকারেই শেষ হয়ে যায়নি, একটি সূর্যের মত দীপ্যমান বিপ্লবের আলো জ্বালায়—যে আলো চিরন্তন, আজও অপরিম্লান, মহাকালের সঙ্গে যার চলা,—তাকেই স্বাগত জানিয়েছে। কবি সুকান্তর বিশ্বচেতনা তা-ই!

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষণ থেকে এখানেই সুকান্তর বিশ্বচেতনায় মৌল প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয় বিশেষ কবি-আত্মাকে নির্বিশেষ মানুষের প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করায়।

আর সুকান্তর বিশ্বপ্রাণতা! বিশ্ববিপ্লবের প্রেক্ষিতে মানব-সত্যের মানবিকতার দলিলে স্বাক্ষর রেখে বিপ্লব সংঘটনের মধ্যেই স্বীকৃত!

মৃত্যুর সমুদ্র শেষ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন॥

এই যে আত্ম-জাগরণ, বস্তুত তা কবিচিত্তে বৃহৎ বিপ্লববোধের জাগরণ! এ জাগরণে লেনিন এবং কবি সুকান্ত এক!

'বিবৃতি' কবিতায়—

রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল

এমন চমৎকার কাব্যিক অভিব্যক্তির মধ্যেকার 'ইমেজ' কল্পনায়, বা, বলা ভাল, চিত্রকল্পের অভিজ্ঞতায় বিপ্লবের বড় কাব্যিক যাথার্থ্য দান ঘটে গেছে। রাত্রি আর প্রভাত—দুয়ের মাঝখানেই তো সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ড'!

'বিবৃতি' কবিতার শেষে 'থরো থরো জীর্ণ বনিয়াদ'-কে প্রতীক করে বিপ্লবের ব্যঞ্জনা আনার প্রয়াস আছে সুকান্তর। বনিয়াদ জীর্ণ হলে হবে বাতিল, আর তারই ওপর গড়বে নতুন ইমারত। 'থরো থরো' শব্দ প্রয়োগে সেই পরিবর্তনের একটা সূক্ষ্ম সংকেত থেকেই যায়।

'চট্টগ্রাম : ১৯৪৩' কবিতায় কবি যেন এক বিপ্লব রচনার জন্যই কল্পনা করে 'দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর'-এর। আর যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—সবই রক্তপাত ছাড়া সম্ভব নয়, তাই লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত কবি বিপ্লবেরই ঘোষণা শোনায় কবিতার শেষতম তিন চরণে—

দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।

ইতিহাসের বিপ্লব আর বিপ্লবের ইতিহাস এমন সব চরণে কবিপ্রাণের বিপ্লবী আর্তির অক্ষরে লেখা।

বিশ্ব ইতিহাসে লেনিনের নির্দেশ বিপ্লবের, বিপ্লব ঘটানোর। এই নির্দেশকে যদি ধ্রুবনক্ষত্র বলে মনে করা যায়, তবে 'ঐতিহাসিক' কবিতায় কবি সুকান্ত বিপ্লবের ধারাকেই যেন প্রতীকে ধরে রাখে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রবহমান সুষমায়—

আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন॥

'ফসলের ডাক : ১৩৫১' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে 'কাস্তে', যেন বা একই সংগে কৃষি ও কৃষক-বিপ্লব—দুয়েরই প্রতীক। দেশের ফসল দেশের মানুষ খাবে, দেশের কৃষক তারই মধ্যে পাবে সর্বদিকের আশ্রয়, সান্ত্বনা। এই চিন্তাই তো কৃষিবিপ্লবের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর—
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

'কৃষকের গান' কবিতার শেষে কবিকণ্ঠে যখন শুনি—

মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥

তখন নতুন সভ্যতা গড়ার বীজমন্ত্র যে বিপ্লবের মধ্যেই নিহিত, তার সার্থক স্বীকৃতি-চিহ্নটি কিশোর কবি তার পাঠকদের অবলীলায় ধরিয়ে দিয়ে যায়।

'ছাড়পত্র' কবিতার শেষে সুকান্ত লিখেছে—

অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ।
তারপর হব ইতিহাস।

এখনকার শিশু যদি সুকান্তর নিজের ব্যাখ্যামত সদ্যোজাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হয়, তবে সেখানেও সেই নতুন বিপ্লবকে স্বীকৃতি দান বাসনা। সুকান্তর সময়ে দেশ এক বিদেশী রাষ্ট্রের উপনিবেশ, দেশের অভ্যন্তরে জমিদারের প্রচণ্ড দাপটে ও সাম্রাজ্যবাদীদের পোষকতায় নিষ্ঠুর রূপ। সমস্ত মানবিকতা সেখানে অবহেলিত। সমাজতন্ত্র সেখানে দুঃস্বপ্ন! এমন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিকে যদি কবির আশীর্বাদে ধন্য হতে হয়, তবে সেই আশীর্বাদ দেশের বিপ্লবকেই আহ্বান জানায়, কবির ইতিহাস হওয়ার বিষয়টি বিপ্লবের নতুন ইতিহাস রচনাকেই করে সংকেতিত।

সুকান্ত এইভাবে বিপ্লবকে কবিতায় জানায় স্বাগত।

সুকান্ত-জীবন স্বল্পায়ু, কিন্তু তার বিপ্লব-বাসনা নিরবধি মহাকালের আয়ুর সংগে চলমান। তার বিপ্লবচিন্তা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে এক সূত্রে গ্রথিত করে একটি চলমান সমাজ ভাবনা তথা মানব-ভাবনারই নামান্তর। সুকান্তর কাল বিপ্লবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। বিপ্লবের মাটি তৈরী হতে থাকে। বিদ্রোহ, গণবিক্ষোভ এসব দিয়েই বড় বিপ্লবের মাটি রচনার কাল সুকান্তর কাল।

সুকান্ত বিপ্লবের এমন ধারণা কবিমনের গভীরে পোষণ করত বলেই 'উদ্বোধন' কবিতার শেষতম পংক্তিগুলির কাব্যময়তা এমন স্বতঃস্ফূর্ত।

চিনে নেবে পথ দৃঢ় লোহার,
যে পথে নিত্য সূর্যোদয়

আনে প্রলয়,
সেই সীমান্তে বাতাস বয় ;
তাই প্রতীক্ষা—ঘনায় দিন
স্বপ্নহীন।

যে কোন বিপ্লবের ক্যানভাস, তার প্রয়োগ, তার ব্যাপকতা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ দেশে তার উদ্ভব কিন্তু বিশ্বের সর্বসমাজে তার লালন, প্রয়োগ, বর্ধন। সুকান্ত কবিতায় বিপ্লবকে স্বপ্নহীন প্রতীক্ষায় ধরে রাখলেও দেশের গণবিক্ষোভকেও দেশীয় করে ভেবে গেছে শিল্পের মর্যাদায়।

প্রমাণ, 'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতা। উনিশ শ ছেচল্লিশ সালের ষোলোই আগস্টে এক জঘন্য ইতিহাস রচিত হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। সুকান্তর কবিমন তাতে গভীর ব্যথিত। কিন্তু কমিউনিস্ট কবি, জীবন প্রত্যয়ে শপথ নেওয়া কবি তো ভেঙে পড়তে পারে না। গণবিক্ষোভের দলিল রচনা হয়ে যায় 'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতায়।

আর এই দলিলেই সুকান্ত লিখে দেয় এক মানবদরদী কবির সর্বমানববাসনা—

জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

দাঙ্গা-ক্লান্ত ও কলঙ্কিত কলকাতার বুকে বসে কবির বাসনা, হয়ত সমস্ত মানুষের কাছে দাবিও—

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস—
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।

দাঙ্গা, গণবিক্ষোভ ও কবিপ্রাণতার এমন যে জীবন্ত কাব্যচিত্র—সুকান্ত ছাড়া আর কোন্ কবি এমন সততায় আঁকতে পারে? এমন প্রত্যক্ষতায় দলিল করে যেতে পারে?

'মজুরদের ঝড়' কবিতায় কবি স্পষ্ট বিক্ষোভকারীদের দলে।

বেরিয়ে এসো ধর্মঘট ভাঙা দালালরা ;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এসো।

বিক্ষোভের ভাবনায় ও চিত্র রচনায় কবির তীব্র শ্লেষ ধারালো ছুরির ফলার মত এই গদ্য কবিতার প্রতিটি চরণে চকিত হয়ে ওঠে।

'ডাক' কবিতায় স্পষ্টত গণবিক্ষোভের ছবি—

ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো হুংকার কোটি অবরুদ্ধের।

নিরন্ন জনতার প্রতিবাদে সোচ্চার মিছিলকেও কবি কবিতার বিষয় ও চিত্রকল্প থেকে বাদ দেয়নি। 'মৃত্যুঞ্জয়ী গান' কবিতার অন্তে তার সেই চিত্র—

সহসা জানালায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে,
সে মিছিলে শোনা গেল—
জনতার মৃত্যুঞ্জয়ী গান।

সুকান্তর কবিতার গণবিক্ষোভের চিত্র যেন সামগ্রিকভাবে কবির স্ব-কালের কলকাতার জীবন্ত চিত্র—কোন কাল-সচেতন শিল্পীর রঙ তুলি দিয়ে আঁকা একেবারে বাস্তব প্রাণের ছবি।

স্পষ্টই বোঝা যায়, সুকান্ত কালকে কিছুতেই অস্বীকার করতে চায়নি, চায়নি তার যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবমাননার দিকগুলিকে ঢেকে কবিতা রচনা করতে!

কোন ফাঁকি ছিল না সুকান্তর কবিতার, কাব্য বিষয়ের, কবি ভাবনায়। আয়নায় প্রতিফলিত বিম্বের মত সুকান্তর কবিতায় গণবিক্ষোভের ছবি।

এ বিষয়ে কবি সুকান্ত স্বয়ং যে অতিসচেতন, তার প্রমাণ 'বিক্ষোভ' কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে—

ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।

আর আশ্চর্য, সুকান্তই বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণবিক্ষোভের কথা লিখে চিরকালের ইতিহাস হয়ে গেছে তার সমস্ত কবিতায়।

সুকান্তর কবিতায় ইতিহাস, সুকান্তর কবিতা ইতিহাস, সুকান্ত নিজেও ইতিহাস।

ইতিহাসের এমন বিশাল পরিচয় আর কোন্ কবির মধ্যে, কোন্ কবির কাব্যে পাওয়া যায়?

দশম অধ্যায়

ছড়ার রচনাকার কবি সুকান্ত

সুকান্ত বয়সে কিশোর, কিন্তু সমকালের কিশোরদের মধ্যে সে ছিল অনেক বড়—সে কিশোর-পুরুষ!

সেই সংগে কবিপ্রাণতা ছিল বলে কিশোর-সংগীদের নেতা হয়ে, কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব থেকে মনে-প্রাণে অনুভব করে কিশোরদের একটি মজবুত সংগঠনের কথা। সংগঠন গড়েছিল সুকান্ত, সুদক্ষ সেনা-নায়কের মত সুকান্ত ছিল সেই সংগঠনের এক অক্লান্ত কর্মী এবং একমাত্র উপদেষ্টা ও নেতাও।

সুকান্ত বাইরে কিশোর-কর্মী, কিশোর নেতা, ভিতরে কিশোর-পুরুষ।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শুরু থেকে কিশোর বাহিনী গড়ার কাজ শুরু হয়ে যায় সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। সেই সংগে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার মধ্যে কিশোরদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ তৈরী হয়। একসময়ে সুকান্তই তার ভারপ্রাপ্ত সচিব!

এই কবি কিশোর-পুরুষ কিশোরদের সংগে মিশে, কিশোরদের কথা ভেবেই বড়দের জন্য কবিতা লেখার ফাঁকে কিশোরদের উপযোগী ছড়াও লিখতে বসে ত্ব'হাতে।

প্রয়োজনের তাগিদেই সুকান্তর হাতে সার্থক ছড়া জন্ম নেয়।

শুধু কি প্রয়োজনেই ছড়া লেখে সুকান্ত?

মনে হয়, কবিপ্রাণে প্রয়োজন ছাড়াও আরও সূক্ষ্ম দিক ছিল ছড়ার জগতে বিচরণ করার বিষয়ে!

ছড়ায় আছে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রও! বাংলাদেশের পুরনো লৌকিক ছড়া তারই প্রমাণ দেয়। কিশোরদের সোজাসুজি উপদেশ দেওয়ার বদলে গল্পের আমেজ দিয়ে হাল্‌কা ছন্দে মূল বিষয়টা একেবারে মর্মে ঘা দেওয়ার মত করে দিলে কেমন হয়?

সম্ভবত এমন ভাবনাও ছিল কিশোর কবি-প্রাণের অভ্যন্তরে!

আর! সুকান্ত জানত, সোজা আঘাত না করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, শ্লেষে-কৌতুকে যদি বক্তব্যকে প্রতিপক্ষের সামনে রাখা যায়, তা হলে বোধ হয় কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়, উদ্দেশ্য অনেকটা সফলতার দিকে এগিয়ে যায় অবধারিতভাবে। ছড়া তেমনি এক মাধ্যম—যার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করা যায় ভদ্রতার মুখোশধারী, গরীবের দরদীর ছদ্মবেশী ধনিক শ্রেণীকে। তার জন্যও এমন কিছু ছড়ার জন্ম ঘটে যায় সুকান্তর কলমে!

ছড়া রচনা এক কবিমনের পক্ষে 'রিলিফ'-ও বটে, আবার ছন্দের ও বিষয়ের কথা ভেবে নিজস্ব পরীক্ষা-প্রয়াসও বুঝি! সুকান্ত ছড়ায় করেছে বিষয়ের পরীক্ষা, ছন্দের পরীক্ষা।

সুকান্ত ছিল রাজনৈতিক কর্মী—যাকে পোষ্টার লিখতে হত, পোষ্টার হাতে নিয়ে সারা রাত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হত। পোষ্টারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভাষা, বক্তব্য তো গুরুগম্ভীর দার্শনিক হবে না! চাই লোকজীবনের ভাষা, ছন্দ, চাই লোকপ্রাণের প্রয়োজনীয় বক্তব্য! হাল্‌কা চালে পোষ্টারে যদি কিছু কবিতার বিষয়ে ও রীতিতে সহজবোধ্যতা থেকে যায়, মন্দ কি? পোষ্টারের লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পর্যুদস্ত করা, তার স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া।

সুকান্তর ছড়া যেনবা সেই পোষ্টারের কিছু 'মিঠে কড়া' পংক্তি।

সুকান্তর ছড়ায় এমন সব উপাদান, কাহিনী, ঘটনা আছে, যা দিয়ে শিল্পীর ব্যঙ্গ চিত্রে এঁকে একটি সার্থক রাজনৈতিক বা অ-রাজনৈতিক পোষ্টার চিত্রের প্রদর্শনীও করা যায়।

না, কোন গুরু গম্ভীর বক্তব্য নয়, কোন সাম্যবাদী শ্লোগান নয়, তত্ত্বকথা নয়, একেবারে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে পাঠকদের নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করা। ছড়া নয়, তবু 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় যেমন শেষতম চরণেই কবি ভয়ংকর বেদনাদায়ক একটি পরিণামী বিষাদের দুঃসহ চিত্র এঁকেছে, তেমনি

ছড়ার মধ্যেও আছে হাসির স্রোতের মধ্যে কঠিন মর্মবিদারী তীব্রতম হুল ফুটানোর গোপন প্রয়াস!

ছড়ায় সুকান্ত এক নিপুণ শিল্পী।

ছড়া-রচয়িতা সুকান্তর মধ্যে আছে উত্তরকালের বহু ভাল ছড়া রচনার প্রেরণা, নমুনা!

সুকান্তর ছড়া একেবারে শিশুদের জন্য নয়!

সুকান্তর ছড়া গতানুগতিক চাঁদ, আকাশ, তারা, সূর্যিমামার কথায় পঞ্চমুখ নয়!

সুকান্তর ছড়া সমকালের এমন এক চিরকূট যার মধ্যে উত্তরকালের ছড়ার স্বভাব বদলাবার নির্দেশ আছে!

'মিঠে কড়া'—এমন নাম দেওয়া সুকান্তর নিজেরই। ছড়ার নাম মিঠে কড়া! 'ছড়া' আর 'কড়া' এই শব্দ দু'টির ধ্বনি-অনুষঙ্গ সুকান্তর ছন্দের ও শব্দ-ধ্বনির কানটিকে সুন্দর বুঝিয়ে দেয়।

মিঠে কড়া ছড়া!

সত্যই মিঠে কড়া! 'বিয়ে বাড়ির মজা', 'ভেজাল', 'রেশন কার্ড', 'ভাল খাবার', 'ব্ল্যাক মার্কেট', 'ঋণ সমস্যার সমাধান', 'পুরনো ধাঁধা' —এমন সব ছড়ায় যে মেজাজ তা 'লেনিন', 'বিবৃতি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'ছাড়পত্র', '১লা মে-র কবিতা '৪৬'—এসবের কিশোর কবিকে বিপরীত মেরুতে নিয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য! কোন ছড়া তার কবিতা থেকে স্বতন্ত্র নয়। ছড়ায় যা লঘু চালে, গল্পে-কথায়, সংলাপে-ঘটনায়, কবিতায় তা-ই আছে গুরু-গম্ভীর ভাবনায়!

সুকান্তর কবিদৃষ্টির সামনে ছিল রক্তিম স্বপ্নময় এক ভবিষ্যতের ভাবনা, ছিল শাসকদের অবারণ উৎপীড়নহীন, শোষণহীন সমাজ, জাতি, দেশ গড়ার আদর্শ! ছড়ায় এমন কথাকেই অতি ছোট ছোট অনুভবে ঘটনায়, চরিত্রের ফ্রেমে ব'সিয়ে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তোলে সুকান্ত!

সুকান্তর ছড়া নিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্য অত্যন্ত

মূল্যবান, সুকান্তর ছড়ার তাৎপর্য ধরার পক্ষে একটি একান্ত প্রয়োজনীয় চাবি কাঠি।

'বড়োরা অবাক হয় সুকান্তর কবিতা পড়ে। আন্থিকালের বন্থিবুড়ির ছড়া নয় একেবারে টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে, চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে সূর্য-ওঠা দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখেনি।'

সুকান্তর 'মিঠে কড়া' বই-এর শেষে ছড়ায় লেখা 'আজব লড়াই' পদ্যটাই প্রথমে ধরা যাক। ছড়াটিতে কলকাতা শহরের বুকে এক ফেব্রুয়ারী মাসে জনতার সংগে সরকারী পুলিশ বাহিনীর দুর্মদ প্রতিরোধের কথা। সেই কথা সার্থক চিত্রে মনোরম।

এমন ছড়ায় সুকান্ত শ্লেষ মেশানো কৌতুকের স্বভাবটি ত্যাগ করেনি—

বড়রা কাঁদুনে গ্যাসে কাঁদে, চোখ ছল ছল
হাসে ছিঁচ কাঁদুনেরা বলে, 'সব ঢাল জল।'

আবার, এর পাশাপাশি সুকান্তর রাগী মনের প্রকাশ আছে মিঠে কড়া মেজাজের উপযোগী লঘু চালে মিঠে কড়া ভাষায়—

ইঁট-পাটকেল দেখি রাখে এরা তৈরি,
এইবার যাবে কোথা, বাছাধন বৈরী!
ভাবো বুঝি ছোট ছেলে, একেবারে বাচ্চা!
এদের হাতেই পাবে শিক্ষাটা আবছা;

মনে হয় আন্দোলনের বিদ্রোহের চিত্রের গাম্ভীর্যকে লঘু করে সুকান্ত তার মধ্যে চোলাই করে দেয় ব্যঙ্গরস আর নির্ভেজাল কৌতুক। ছড়া ছন্দের এমন কৌতুক ভাষণে অদ্ভুত ভাবে আসে উপহাস, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য—এসব সেই বন্দুকধারী প্রতিপক্ষকে মনে রেখেই।

ঢিল খাও, তাড়া খাও, পেট ভরে কলা খাও,
গালাগালি খাও আর, খাও কানমলা খাও।
জালে ঢাকা গাড়ি চড়ে বীরত্ব কী যে এর
বুঝবে কে, হরদম সামলায় নিজেদের।

প্রতিপক্ষের ভয়ংকর শক্তি সত্ত্বেও অসহায়তার চিত্র অংকনে সুকান্ত এক প্রবল ব্যঙ্গ মেশানো হাসির ঢেউ তোলে এই সব চরণে।

ছড়ায় সুকান্ত ভোলেনি বস্তির মানুষকে, নীচের তলার তেজী, সবল প্রাণের শহীদদের। তাদের নামে বেদী হয় না, তাদের নাম কেউ জানে না। এমন মানুষের কথা উল্লেখ করে সুকান্ত লেখে—

ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোট প্রাণ দেয়
স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলী জান,
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিল প্রাণ।

'আজব লড়াই'-এর শেষ স্তবকে সুকান্ত একটি চরণ লেখে—

বড়োদের বোকামিতে আজো প্রাণ ছটপট,

এমন একটি চরণের প্রতিধ্বনিই যেন শোনা যায় অন্নদাশংকর রায়ের 'খুকুর নালিশ' ছড়ার মোক্ষম বিদ্রূপের মধ্যে—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা!

সুকান্তর 'বড়দের বোকামি' আর অন্নদাশংকর রায়ের 'বুড়ো খোকাদের ভারত ভাগ' করার মধ্যে অদ্ভুত তাৎপর্যগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

'অতি কিশোরের ছড়া' আর 'এক যে ছিল'—দু'টি সুকান্তর সহজ সরল মেজাজের ছড়া। প্রথমটিতে আত্মসমালোচনার ছলে সমস্ত কিশোর সমাজের স্বভাব বর্ণনার সুনিপুণ প্রয়াস, দ্বিতীয়টিতে আছে এক রবীন্দ্র-ভক্ত অনুজতম কবির দিক থেকে জ্যেষ্ঠ কবির কিশোর কালকে মনে রেখে কিশোর মনের ধন্দ রচনার প্রয়াস।

'অতি কিশোরের ছড়া'য় সুকান্ত কিশোরদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানায়—

পণ্ডিত আর বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া,
ভাবি উপদেশের ষাঁড়ে করবে বুঝি তাড়া।

'উপদেশের ষাঁড়ে' শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে যেমন 'চক্ষু-কর্ণ ডানায় দু'টি ঢাকা' বৃদ্ধ জরদ্গবদের উপদেশের ভয়কে সচিত্র করেছে, তেমনি কিশোরদের প্রতি সদয়-উপদেশবাণী বর্ষণকারীদের সম্পর্কে ধারণাটিও ব্যক্ত হয়েছে।

'পৃথিবীর দিকে তাকাও' নামের দীর্ঘ ছড়ায় লেখা পদ্যে মজুরদের পাশে থেকে সুকান্ত এই উপদেশ নিয়েই এক ব্যঙ্গাত্মক প্রেক্ষিত রচনা করেছে কবিতার মধ্য অংশে।

আমাদের দেশের মজুরদের, শ্রমিকদের অবস্থা কিরকম ?

খাওয়ার সময় ভোঁ বাজলে তারা
ছুটে আসে পাল পাল,
খায় শুধু কড়কড়ে ভাত আর
হয়তো একটু ডাল।
কম-মজুরির দিন ঘুরে এলে
খাদ্য কিনতে গিয়ে
দেখে এ টাকায় কিছুই হয় না,
বসে গালে হাত দিয়ে।

এমন যে কুঁড়ে ঘরের দুস্থ, অর্থ-হীন, শোষকদের শাসনে পিষ্ট মজুর, তার অসহায়তার সময় উপদেশবাণী যে কি নির্মম পরিহাস সুকান্ত একে একে তার নমুনা আঁকে বিপরীত বক্তব্য রেখে।

পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনো প্রভু
(সুতরাং চুপ ; কথা বলবে না কভু)
সকলেরই প্রভু—ভাল আর খারাপের
তাঁরই ইচ্ছায় এ ; চুপ করো সব ফের।

সুকান্ত মার্কস্‌বাদে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজবাদে। পুরোহিত-তন্ত্র, ধর্মতন্ত্র সবই সেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার তৈরী করা অস্ত্র—যা দিয়ে মানুষকে, মানবতাকে রোখা যায়। ধর্মের অফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখায় সুকান্তর তীব্র ঘৃণা। এমন পুরুতের উপদেশ যে কি জাতীয় ভাঁড়ামো বা প্রহসন—মজুরের অসহায় অবস্থার পাশে কবি এনেছে এমন বিপরীত বক্তব্য !

আর শিক্ষকদের উপদেশবাণী কি রকম? সে তো তাদের ধর্ম ও কর্মের মধ্যেই নিহিত।

'যে কথা একশবার বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম ও কর্ম।' ('সবুজপত্রের মুখপত্র' / প্রমথ চৌধুরী) তার উপদেশ তো চর্বিত চর্বণ। মজুরের অন্নহীন অবস্থার অসহায়তায়—

> শিক্ষক বলে, শোনো সব এইদিকে,
> চালাকি ক'রো না, ভাল কথা যাও শিখে।
> এদের কথায় ভরসা হয় না তবু?
> সরে এসো তবে, দেখ সত্যি কে প্রভু
> ফ্যাকাশে শিশুরা, মুখে শাস্তির ভীতি,
> আগের মতোই মেনে চলে সব নীতি।

সুকান্ত তার ছড়ার এইভাবে যান্ত্রিক, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ পুরোহিত ও তথাকথিত শিক্ষকদের স্বরূপ এঁকে গেছে 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' ছড়া-কবিতায়। এই ছড়ার নায়ক যে মজুর সে কম মজুরির দিনে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার মধ্যে অর্থাৎ সমাজ বৈষম্যের অসহ্য অবস্থার মধ্যে কেবল মারই খায়, খাদ্য পায় না, অর্থ পায় না!

> যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়,
> পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।

ছড়ার মধ্যেও সুকান্ত মালিক-শ্রমিক, ধনিক-গরীব প্রসঙ্গকে বিস্মৃত হয়নি।

'ভেজাল' ছড়া-কবিতায় আছে দেশের সর্বাবয়ব একটি ছবি। কবিতাটির আরম্ভ ব্যঙ্গের সুরে, সমগ্র দেহে ব্যঙ্গ, কবিতার শেষ চরণেও ব্যঙ্গ। কিন্তু দুটি চরণে সুকান্ত শুভ্র, পবিত্র হিউমার-এর পরিচয় রেখেছে ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের 'বিড়াল', 'আমার মন' ইত্যাদি রচনার হঠাৎ-হঠাৎ শরতের মেঘে বিদ্যুৎ-চমকিত কোন বাক্যের মত!

> ভেজাল নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
>
> * * *
>
> ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই।

'গোপন খবরে' আছে বোমা-বিধ্বস্ত কলকাতার এক করুণ ছবি। কলকাতা যুদ্ধ-আতঙ্কে, কখনো বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হ'তে হ'তে বেঁচে যায় উনিশ শ বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালে। সেই দুঃসহ ও দুঃস্বপ্নের স্মৃতিসূত্রে সুকান্ত যুদ্ধ-শেষের কলকাতায় বসে বুঝিবা কবির হতাশাতেই বলে ওঠে—

হায়রে! —গাছটা চুরি গেছে…কোথায় কে তা জানে।
গাছটা ছিল। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি,
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি॥

শহর কলকাতা—আধুনিকতম এই শহর—সমস্ত যন্ত্রসভ্যতায় গড়া শহর যুদ্ধের শেষেও! সেই শহর থেকে প্রকৃতি উধাও। অথচ মানুষের প্রাণ, মুক্তি এই প্রকৃতির মধ্যেই!

হয়ত বা 'গোপন খবরে' সুকান্ত জানায় যুদ্ধের ভয়াবহ দিনশেষের সংবাদ! এই সংবাদ দানে সুকান্ত নিয়েছে কৌতুক, শ্লেষ আর নিজস্ব স্বস্তি।

'জ্ঞানী' কবিতায় চরিত্র আছে—বরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই ছড়া-কবিতা বস্তুত এক আত্মভোলা, পণ্ডিতম্মন্য, বাস্তবজ্ঞানরহিত মানুষের চরিত্রচিত্র। মানুষের তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তবজ্ঞান যে একই সঙ্গে হাত ধরে সব সময় চলে না, এই দুই বিপরীত কথাই বরেনবাবুর চরিত্রচিত্রের সমস্ত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্যকে করেছে বিশ্বাস্য!

'মেয়েদের পদবী' নিছক কৌতুকরসের ছড়া। হয়ত এই ছড়ায় সেকালের বিদেশী রীতির পদবী উচ্চারণকে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রেও—ব্যঙ্গ করার মানসিকতা সক্রিয়! এই ছড়ার প্রথম কয়েক চরণেই যেন তার সূক্ষ্ম নির্দেশ আছে :

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি;
'আ'কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোষ্টকার্ড, খামে।

সুকান্তর হাতে একসময়ে বুঝি গল্প লেখকের কলমও থাকত! ছড়ায় তার যে প্রমাণ, তা 'বিয়ে বাড়ির মজা'-তেই দেখা যায়। বর আসার সময় দেখা গেল—

বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে,

*　　　　*　　　　*

বর নয়কো, লাল-পাগড়ী পুলিশ আসছে নেমে!

বিয়ে বাড়ির বিরাট আনন্দের মধ্যে হঠাৎ এমন চমক গল্পের গতিকে করে তীব্র। কিন্তু এখানেই সুকান্ত থামেনি। সুকান্ত চলে আসে তার স্বভাব অনুযায়ী গেটের বাইরে দাঁড়ানো কাঙালীদের পাশে। এমন মন্বন্তর ও অপচয়ের জীবন্ত ছবি, কাঙালীদের অসহায়তার বর্ণময় বর্ণনা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের একাধিক দৃশ্যকে মনে করায়। বিজন ভট্টাচার্য আর কবি সুকান্তর মানসিকতা, পরিবেশ এক তারে বাঁধা! সে সময়ের বিয়ে বাড়িতে ধনীদের খাদ্য নিয়ে যে অপব্যয়, দরিদ্রদের অবহেলা, মজুতদার ও ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের একচেটিয়া অধিকার ভোগ—তাকেই তীব্র ব্যঙ্গ করতে গিয়ে শেষের দুটি চরণ অবলীলায় লেখে সুকান্ত—

কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে॥

দুর্ভিক্ষের সময়ের ও পরবর্তীকালের খাদ্যের বণ্টন বৈষম্য ও তার সূত্রে দরিদ্রদের অসহায়তায় কিশোর-কবিপ্রাণ সর্বদাই ছিল দুঃখ-ভারাক্রান্ত। তাই ছড়ায় লঘুরসে এই খাদ্য ব্যবস্থা ও সেই সূত্রে ধনী দরিদ্রের, শোষক-শোষিতের সম্পর্কের চিত্র একাধিক ক্ষেত্রে আনে কবি 'রেশন কার্ড', 'খাদ্য-সমস্যার সমাধান', 'পুরনো ধাঁধা', 'ব্ল্যাক মার্কেট', 'ভাল খাবার'—এইসব মিঠে-কড়া ছড়া-কবিতায়!

'রেশন-কার্ড' ছড়ায় আছে সে সময়ের রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতি ও দুরবস্থার কথা এবং তারই বলি রঘুবীর নামের এক অতি সাধারণ মানুষ।

'খাদ্য-সমস্যার সমাধান'-এ সুকান্ত মজুতদারকে, তার চতুর বুদ্ধি ও পাটোয়ারী-স্বভাবকে চিত্রিত করে তীব্র শ্লেষ-চিত্রে স্থির করেছে।

মজুতদার সাধারণ মানুষের কেমন বন্ধু? অভাবের দিনে তার কেমন স্বভাব? উপবাসী বন্ধুর অসহায় খাদ্যভিক্ষার কাছে তার দেয় কি?

এই নাও ভাই চাল কুমড়ো,
আমায় খাতির করো,
চালও পেলে কুমড়ো পেলে
লাভটা হল বড় ॥

'পুরনো ধাঁধা' নামের ছড়ায় সুকান্ত স্পষ্টভাবে রাখে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ছবি—আর এই ছবির শেষতম বাক্যটিও গরীবদের প্রতি ধনীদের শাসন-শোষণে নির্মম অবস্থার!

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায় ॥

'ব্ল্যাক মার্কেট'-এর ধনী রাম পোদ্দার আর 'ভাল খাবার'-এর ধনপতি পাল সর্বকালের শ্রেণীবদ্ধ সমাজের অতি-পরিচিত আপনজন।

কে এই রাম পোদ্দার?

গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও
তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাবও।

এমন ধনী রাম পোদ্দারের যেনবা আর এক নাম ধনপতি পাল! এরা একই মানুষ—শুধু সময় বুঝে বেশ বদলায়, স্বভাব বদলায় পূর্ব-স্বভাবেরই অনুগত করে। যে জমিদারের কোন অভাব নেই, কারখানা আর ব্যাঙ্কে যার উদর স্ফীত, তার কিন্তু—

কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই-খাই' বাই তাঁর,

কিন্তু খাবে কি? খাদ্য তার অন্যরকম! সে যে অসাধারণ মানুষ! সাধারণ খাদ্য তার কাছে একেবারেই বিস্বাদ যে!

খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।

এ হেন ধনপতি পালের লোভ-লালসা রাস্তার কুকুরের ঝোলা জিভের মত লালায় প্রতিনিয়তই ঝোলে! খেজুর গাছের শীর্ষের চাঁছা গা বেয়ে যেমন ভাবে রস ঝরে অবিরাম, ঠিক তেমনি ধনপতি পালের ধন-বাসনা!

দিন রাত চিৎকার : আরো বেশি টাকা চাই,
আরো কিছু তহবিলে জমা হয়ে থাকা চাই।

কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? শাসন আর শোষণেই তো টাকা আসে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার তাই তো নির্দেশ। জমিদার-শ্রেণী তারই সৃষ্টি। আর প্রজা! তারাই তো যোগাবে টাকা শ্রম দিয়ে, দ্রব্য উৎপাদন করে! তাই ধনপতির নায়েবকে অতি সতর্কতার সংগে, শয়তানের হাসির মত হাসির মধ্য দিয়েই বলা—

সব চেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় একটি মোরগ এসেছিল 'অবশ্য খাবার খেতে নয়—খাবার হিসেবে।' ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে! সেই খাবার টেবিল তো এই ধনপতি পালেরই!

সুকান্ত এইভাবে 'বড়রা অবাক হয় সুকান্তর' যে 'কবিতা পড়ে', তার সংগে ছড়া-কবিতার অদ্ভুত যোগ রেখে গেছে!

ছড়ায় সুকান্ত অনন্য। বাংলা সাহিত্যে নতুন ছড়ার জন্মদাতা। সুকান্তর ছড়ায় চাঁদ নেই, আছে রক্তিম আকাশ—তা ভোরের নয়, গোধূলির। আছে মধ্যাহ্নের সূর্যের জ্বালা—সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য গরমের দিনের নয়, শীতের—যে সময়ে জ্বালার সংগে স্বস্তির মলমের মত থাকে মধুর ভাব!

সুখ দুঃখের বিপরীত, আনন্দ দুঃখের পরিপূরক। সুকান্তর কবিতা যদি 'দুঃখ' হয়, তার ছড়া সেই দুঃখের পরিপূরক 'আনন্দ'।

সুকান্তর দুই হাত দুই দিকে—এক হাতের মুঠি মুষ্টিবদ্ধ, তা ধনিকদের, লোভীদের দিকে উদ্যত, সেই সংগে উদ্ধতও!

আর এক হাত মজুর, শ্রমিক, কৃষক—সর্বহারাদের দিকে। সেই হাত উন্মুক্ত, তাদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে উদ্যত। সে উদ্যমে আন্তরিকতা চিরকালের এক মানবিক কবির মানব-প্রাণের!

যে কোন কবিতার গান হতে আপত্তি নেই, কিন্তু সুকান্তর কবিতা গানে রূপ নিলে সুরকার-সুরে, গায়কের কণ্ঠে সেই কবিতার ভাব, ভাষা, লক্ষ্য আরও এক স্বতন্ত্র সৃষ্টির মায়ায় নতুন হয়ে যায়।

সুকান্তর কবিতার গান, সুকান্তর অবাঙ্‌মনস্‌গোচর আত্মারই আর এক প্রকাশরূপ।

সুকান্ত-রচিত কবিতার ভাষা আর সুকান্ত-নির্দিষ্ট গানের ভাষায় কত দুস্তর ব্যবধান।

কিন্তু সুকান্তর কবিতা—যা একবার গানের সুরে, কণ্ঠে মিলে-মিশে হয়েছে উতরোল, তার অশরীরী আকর্ষণ জনগণকে মাতাল করে দেয়।

যুগের প্রয়োজনে সুকান্তর কবিতা হয়েছে গান, কালের দাবির কাছে একাধিক কবিতা উন্মত্তরূপ পায় সবল গীতি রসে।

'গীতিগুচ্ছে'র গীতিকার সুকান্ত আর কবিতাকে সংগীতে রূপান্তরিত করায় গীতি-কবিতার সুকান্ত—দুই স্বতন্ত্র রূপে পাঠক হৃদয় জয় করে অবলীলায়।

গীতিগুচ্ছের সুকান্তর গানে কবির দুই দৃষ্টি—এক দৃষ্টি প্রেম স্পর্শে মেদুর বিধুর, আর এক দৃষ্টি প্রকৃতি-ভাবনায় সুদূর। গানে প্রেম ও প্রকৃতি ভাবনায় কবি সুকান্ত যে অত্যন্ত সচেতন, তার প্রমাণ—সুকান্তর কবিতার বিষয় ও ভাষা এবং গানের বিষয় ও প্রকাশরীতির দুই ভিন্ন রূপে।

সুকান্তর লেখনীতে গানের জন্ম তার সচেতন মনেরই ফসল।

সমবয়সী মামা বিমল ভট্টাচার্য ছিলেন সঙ্গীতসাধক ও সংগীতজ্ঞ।

আত্মীয় অথচ বন্ধুর মত কিশোর সুকান্তকে দিয়ে গান লিখিয়ে নেন মামা বিমল ভট্টাচার্য। নিশ্চয়ই মামার বিশ্বাস ছিল সুকান্তর অসাধারণ কবি-ক্ষমতায়। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান বহুবিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত।

বিশ্বকবির হাতে গান, সে যেন নন্দনকাননের এক একটি ফুলের রঙে-আলোয় ফুটে ওঠা।

কনিষ্ঠ কবি সুকান্তর ওপর বুঝিবা সেই কবিক্ষমতার বিশ্বাস নিয়েই

মামা অনুরোধ জানান গান রচনা করার। এমনও শোনা যায়, মামা বিমল ভট্টাচার্য সেই সুকান্তর লিখে দেওয়া গানের খাতার পাতায় বেশ কিছু গানে সুর ও কণ্ঠ যোগ করেছিলেন।

সেগুলির সংগীতিক সফলতা কতটা ছিল, সুকান্তর মানস প্রতিক্রিয়া সেই সব গানের সুর ও কণ্ঠ কত মুগ্ধতায় স্থিত ছিল, তার প্রামাণিক তথ্য আজও অজ্ঞাত।

সম্ভবত এমন অজ্ঞাত তথ্য চিরকাল একই তিমিরে থেকে যাবে।

তবু 'গীতিগুচ্ছে'র উনিশটি গান—যা বিমল ভট্টাচার্যের খাতা থেকে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সুকান্তর আর এক কবিমন, আর এক নির্জন সত্তা! যেনবা কবির নির্জন মনের গভীরে এক নতুন কীট্সীয় নাইটিং গেলের আপন মনে গান গেয়ে যাওয়া!

'লেনিন,' 'বিবৃতি', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', '১লা মে'র কবিতা '৪৬', 'অনুভব'—এমন সব কবিতায় সুকান্তর এক জন্ম, 'গীতিগুচ্ছে'র সুকান্তর আর এক জন্ম!

একদিকে কঠিন, কঠোর, আপসহীন মন ও প্রাণের বিদ্রোহী আত্মার কবি সুকান্ত!

আর একদিকে কোমল, রবীন্দ্র ভাবে-অনুভবে সংগীত রচয়িতা কবি সুকান্ত!

সুকান্তর কবিতায় কবির প্রতিবাদী, শাসন-নাশনে রক্ত চোখ, সুকান্তর গানে আবেশ-বিহ্বল, আত্মানুগত, পেলব-কোমল ভাব-ভক্ত চোখ!

সুকান্তর গীতিগুচ্ছের গান যেন এক অনাবিষ্কৃত কবিসত্তার আর এক অপরিচিত দেশ!

যে কবিকে সমস্ত মিছিলের পুরোভাগে দেখি রক্ত পতাকা হাতে উচ্চকণ্ঠে গাইতে—'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে', অথবা, 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি', সেই কবির নূতন রূপ গীতিগুচ্ছের শব্দে, ছন্দে, চিত্রে, বিষয়ে!

গীতিগুচ্ছে যেন এক কিশোর কবির সাজানো ঘরে নিরালায় বসে আপন মনে গান গাওয়া।

'লেনিন' কবিতায় সে অবকাশ নেই প্রকৃতিকে দেখার, 'বিবৃতি' কবিতায় সে অবকাশ নেই নিজেকে নিজের মতো বোঝার, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় সে সুযোগ নেই নিজের রোমান্টিক কবিসত্তাকে জীইয়ে রাখার। অথবা 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় সে প্রিয়তমাকে কাছে এনে সময় কাটানোর এতটুকু মানসিকতা নেই। গীতিগুচ্ছের গানে আছে সেই কবিমনের ভাবালু সময়, সেই নিজের মনে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করার প্রয়াস।

'গীতিগুচ্ছে'র গান যেন কবি সুকান্তর ক্ষণিকের বিশ্রাম! বাইরে প্রবল বিদ্রোহ, বিপ্লব, বিক্ষোভের ঝড়, কবির অন্তরে তারই সূত্রে একাধিক ভারী ভারী কবিতার জন্ম! এসবের মধ্যে এক ফাঁকে নিজেকে নিজের মত করে বলার চেষ্টাই 'গীতিগুচ্ছে'র গান।

এখানে পোস্টার হাতে কর্মী নেই, সাম্যবাদী মানুষ নেই, মিছিলের নেতৃত্ব-দানকারী বিপ্লবী নেই, নেই কোন কাগজের রিপোর্টার, বাস্তব জগতের সফল দ্রষ্টাও বুঝি এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত!

'গীতিগুচ্ছে'র গানে সুকান্ত এক সর্বাবয়ব সৌন্দর্য-রসিক।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে, রবীন্দ্রনাথের গানের পরিবেশে, রবীন্দ্র কবিতার ভাব, ভাষা, শব্দ, চিত্র দিয়ে আবৃত্তির কণ্ঠ শুনতে শুনতে কবি, কিশোর কবি, কিশোর-পুরুষ কবি সুকান্ত চোখে মেখে নেয় কোন্ সুদূর নীহারিকার স্বপ্নময়তা, মনের ওপরে তুলি বুলিয়ে চলে দিশাহীন লক্ষ্যহীন উড়ে চলার কল্পনার।

নিশ্চয়ই 'গীতিগুচ্ছে'র গানে রবীন্দ্রনাথের নামাবলী গায়ে জড়ানো সুকান্তর, কিন্তু এটাও নিশ্চিত সেই সব গানে এক কবির পক্ষে স্পষ্ট হয়ে আছে গান রচনার অভিজ্ঞ-কৌশল।

এক কিশোর বয়সের কবির পক্ষে এ-ও যেন প্রতিভার আশীর্বচন।

সুকান্তর গান যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

তাতে কনিষ্ঠ কবির ক্ষমতার দীনতা প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায়

জ্যেষ্ঠ, বিশ্বকবির প্রতি কনিষ্ঠ কবির পূজার অর্ঘ্য দিয়ে কাব্যজীবনের শপথ গ্রহণ ।

সুকান্তর গানে রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ গ্রহণের অর্থই হল উপযুক্ত ভক্তের অস্তগামী জীবন প্রান্তে দণ্ডায়মান বিশাল কিরণ-বিচ্ছুরিত সূর্যকে প্রণাম জ্ঞাপন!

'গীতিগুচ্ছে'র গানে আছে কবির রোমান্টিক প্রেমধারণা। 'ও কে চলে কথা না বলে', 'শায়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে', 'দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে', 'হে পাষাণ আমি নির্ঝরিণী', 'এই নিবিড় বাদল দিনে'— এমন সব গান তার প্রমাণ !

আর 'শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে', 'মেঘ বিনিন্দিত স্বরে', 'গুঞ্জরিয়া এল অলি,' 'কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি', 'সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন'—এইসব গানে আছে সুদূর ভাবের রসে সিক্ত প্রকৃতির রূপ !

সুকান্তর সমস্ত গান কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিচিত্র রসাস্বাদী।

বলা যায়, 'গীতিগুচ্ছে'র প্রথম গান রবীন্দ্র-প্রণামে বিনত রবীন্দ্র-বন্দনায় এক ভক্ত-হৃদয়ের কবির সূক্ষ্ম অনুভবের নম্র নিবিড় আত্মায় রক্তিম হৃদয় উন্মোচন।

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা,
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা।
মালাখানি নিয়ে মোর
একা বাঁধিলে অলখ ডোর!
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কী সুর তোলা!

সুকান্তর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যেনবা আত্মবিস্মৃত এক বিশ্ববাউল! এমন এক বাউলের একতারায় যে সুর, সুকান্তর নিঃসঙ্গ কবিমনে যেন তারই সূক্ষ্ম বার্তা প্রেরণ! দেবতাকে মাল্যদান যেন দেবতার সঙ্গে ভক্তের সূত্র-স্থাপন! আর এরই সূত্রে দুই কবির মধ্যে কোন্ এক প্রণাম-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে চিরকালের বন্ধন রচিত হয়ে যায়। এ সমস্তই বিস্ময় চকিত!

রবীন্দ্রনাথ কবি, সুকান্তর মর্মবাসনাও সেই কবি প্রাণের প্রকাশ যথাযথ করা। এক বড় কবির বাণীর মধ্যে যেন থাকে কনিষ্ঠ কবির বাণীরচনার একমাত্র নির্দেশ। অজানাকে জানার বাসনা সমস্ত কবিরই! বিশ্বকবি তো সেই চির অজানার যাত্রী। তাঁর নীরব যাত্রার পথে কবি সুকান্তর যোগ-বাসনায় রোমান্টিক ব্যাকুলতা অবধারিত।

জেনেছ তো তুমি অজানা প্রাণের
নীরব কথা!
তোমার বাণীতে আমার মনের
এ ব্যাকুলতা—

'এই নিবিড় বাদল দিনে' গানে কবির প্রকৃতি ও প্রেম ভাবনা, বর্ষার দিনের প্রকৃতি অনুষঙ্গ আর কবির আত্মোক্তি জাতীয় প্রেমের অভিব্যক্তি—দুই দিক অদ্ভুত সুসমঞ্জস।

শ্যামল রঙ বনে বনে,
উদাস সুর মনে মনে,
অদেখা বাঁধন বিনে
ফিরে কি আসবে হেথা?

শ্যামল রঙের সংগে উদাস মনের যে যোগ, যেন তা 'শ্যাম' নামের সংগে রাধা হৃদয়ের যোগের মত। অথচ সমগ্র গানটিতে গীতিরচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত ছায়া স্পষ্ট।

'গানের সাগর পাড়ি দিলাম,' 'হে মোর মরণ, হে মোর মরণ', 'শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে,' 'মেঘ-অঞ্জন-ঘন' 'মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে'—এমন সব চিত্রে ও চিত্রকল্পে, শব্দে ও শব্দ-ধ্বনিময়তায়, ছন্দের যতি ও ছন্দস্পন্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের যোগ!

কিন্তু সুকান্ত তা দিয়ে যে প্রেম ও প্রকৃতির কথা, যে আর্তি ও বিরহের কথা শুনিয়েছে, সে সমস্ত কিছুই যেন কবির কবি-আত্মার বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত শিল্পী-মনের শব্দ-ধ্বনি-চিত্র-নির্ভর এক পান্থশালা।

দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মৃত্যু, দাঙ্গা—এসবের রক্তক্ষয়ী ভয়াল পরিবেশ যার

বার বিদ্রোহের কণ্ঠে সোচ্চার হতে হতে, মিছিলে সামিল থেকে শ্লোগান দিতে দিতে, অথবা গভীর রাতে দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদী পোস্টার মারতে মারতে কবি সুকান্তর যেনবা একটুকাল বিলাসের বিশ্রাম গ্রহণ !

সুকান্ত মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তায় ও চেতনায় বিশ্রাম নেয়নি। বিশ্রাম বুঝি এভাবেই রবীন্দ্র স্মরণে শরণের মত !

ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আম কর ক্ষমা,
মুক্তি দাও হে এ মরু তরুরে, প্রিয়তমা,
ছিন্ন করো এ গ্রন্থি ডোর
রিক্ত হয়েছে চিত্ত মোর—
নেমেছে আমার হৃদয়ে শ্রান্তি ঘন-অমা।

এমন সব চরণ কোন্ কবি সুকান্তর লেখা ? যে সুকান্ত একদিন লেখে—

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ; (প্রস্তুত)

অথবা

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।
শক্তির উন্মুক্ত হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ :

'গীতিগুচ্ছে'র ওই গানের কণ্ঠ কি সেই সুকান্তর ?

আসলে গীতিকার সুকান্ত আর কবি-সুকান্ত দুই মেরুগামী দুই সত্তা। একজন বিশ্রাম, আর একজন সংগ্রাম। একজন নিঃসঙ্গ, অপরজন বহুর সঙ্গী ! একজন ক্ষণিক মুহূর্তের, অন্যজন শাশ্বতকালের !

একজনের হাতে রাখাল ছেলের বাঁশি, চারপাশে নিঃসীম ধুসর মাঠ, মাথার ওপর ঘন গাছের শীতল ছায়া, খালি গায়ে বসন্তের শীতল সমীরণ !

অন্যজনের দুই হাতে সব্যসাচীর মত ভয়ংকর ক্ষমতার প্রসারণ, আন্দোলন, হাতের মুঠিতে ধরা দধীচির হাড়ে তৈরী নিয়তি-নির্দিষ্ট বিদ্রোহের আগুনে দাকা অস্ত্র !

এক সুকান্ত কান্ত কোমল, আর এক সুকান্ত রুদ্র-ভৈরব।

কিন্তু কাল কবিকে কান্ত কোমল অবকাশ দেয় কম। কবির কাজ ছিল অনেক। কালের আকাশ ভয়াল, রক্তিম। তার দায়িত্ব পড়ে কিশোর-পুরুষ এক কবির প্রাণে, আত্মায়। তাই রুদ্র-ভৈরব রূপেই তার সর্বাধিক পরিচয়, কান্ত কোমল গানে কবির ক্ষণিক বিশ্রাম মাত্র!

সুকান্তর 'গীতিগুচ্ছের' গানের চরণে যেসব শব্দের শৃঙ্খল, যেসব চিত্রের বর্ণময়তা, যে সমস্ত ধ্বনির তরঙ্গ—তার মধ্যে ভার নেই, যুক্তা-ক্ষরের কঠিন দ্যোতনা নেই, নেই কোন গদ্যছন্দে চলার দৃঢ় পদপাত!

গানে সুকান্ত ব্যবহার করেছে কোমল কানের উপযোগী মিল, শব্দ, ধ্বনি! সুকান্তর জীবনে অমিল, কালে অমিল, পরিবেশে অমিল। সুকান্ত তার স্বভাব দিয়ে সমস্ত অমিলকে স্পষ্ট করে গেছে কবিতায়। গানে তেমন অমিল নেই কেন?

নেই, কারণ অমিল তো সব কিছুকে ভেঙে দেয়, সব শান্তিকে অশান্তি করে তোলে। গানে সুকান্ত সে অশান্তি চায়নি। এতটুকু ভালবাসার মত, এতটুকু শান্তির আভিতেই তো এমন উনিশটি গানের জন্ম!

তাই সুকান্তর গান সুকান্তর একান্ত নিজস্ব! নিজেকে নিয়ে নিজেরই কিছুসময় গভীর আলাপনে মগ্ন হয়ে থাকা!

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির গানে মগ্ন ছিলেন একসময়ে!

এক কিশোর কবিও যেনবা তার সার্থক কিশোর-পুরুষ স্বভাবে মুষ্টিমেয় কিছু গানের জগতে নিজেকে মগ্ন রাখার প্রয়াসী। সম্ভবত সর্বদেশের সর্বকালের কবিদের গভীরতম মানস-বৈশিষ্ট্যে দস্তুরিই এই!

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচয়িতা মধুসূদনের হাতে 'চতুর্দশপদী কবিতা-বলী'র সেই ছোট ছোট দীপ্ত সনেটগুলি রচনার পিছনে স্রষ্টার কোন্ মনটি ছিল সক্রিয়?

এমন জিজ্ঞাসা অনন্তকাল ধরে পাঠকদের থেকেই যাবে!

কিন্তু শুধু গান লেখার জন্যই 'গান' লিখে সুকান্তই কিছু গীতিগুচ্ছ

উপহার দিলেও সুকান্তর সমস্ত 'কবিতা'ই যে জাতীয় জনমানসে দুর্মূল্য গানের মর্যাদা পেতে পারে, তার অলিখিত প্রমাণ সুকান্ত নিজেই রেখে যায় কবিতার নামে, লিখিত বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে যায় চারের দশক থেকে আই. পি. টি. এ.র গানের সূত্রে অজস্র সুরকার ও কণ্ঠদাতা গায়কের গান গাওয়ার প্রয়াসে!

সুকান্ত নিজেই নাম দিয়েছে কবিতার—'মৃত্যুজয়ী গান', 'কৃষকের গান', 'বিদ্রোহের গান'. 'রৌদ্রের গান'. 'ঘুমভাঙার গান', 'জনযুদ্ধের গান', 'চৈত্রদিনের গান'।

এই সব কবিতায় সুর দিয়ে একক অথবা সমবেত ভাবে কি গাওয়া যায় না? হয়ত যায়। সুকান্তর জীবিত কালে হয়ত সুকান্ত নিজেই বা দলবদ্ধভাবে দলে থেকে গানে রূপ দিয়ে গেছে!

প্রমাণের অপেক্ষায় না থেকেই বলা যায়, এসব 'গান' নামাঙ্কিত কবিতায় এবং আরও বহু কবিতায় একদিন সুর দিয়ে, কণ্ঠ দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করা হয় শাসকের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিশক্তির বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে! এই প্রয়াসের স্বীকৃতি আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উজ্জ্বল দিনগুলির সময়কার তৎপরতার মধ্যে!

'রানার' কবিতা হয়েছে গান! 'অনুভব' কবিতার '১৯৪০'-এর সার্থক রূপ মেলে এমন গানেই, সুর দেন সলিল চৌধুরী, রেকর্ড করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়! কি ভয়ংকর উন্মাদনা, চাঞ্চল্য, প্রাণাবেগ, সমস্ত মানুষকে আপন করার মত গভীর আকর্ষণী শক্তি ছিল এমন দু'টি গানের সুরারোপে, কণ্ঠ নিক্ষেপে!

সুকান্তর কবিতার গানের রূপে যে প্রয়োগগুণ, তার মূল্য সেকালেই নিহিত। সুকান্তর কবিতার বিষয়, ভাষা বিদ্রোহের, বিপ্লবের, শাসক ও শোষণকারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কারের! যুগের সংগে, সেই কালের সংগে কবিতার যোগ নিবিড়তম—দেহের সংগে রক্ত ও শ্বাসের মত!

তার ওপর ক্ষমতাবান দুই শিল্পী—সুর-শিল্পী ও কণ্ঠ-শিল্পীর যৌথ সমন্বয়!

এঁরাই প্রমাণ করে দেন—সুকান্তর কবিতা আর গণসংগীত

একাত্ম—একটি আর একটির প্রতিবিম্ব। একটি যদি শরীর হয়, অপরটি তার অবধারিত আত্মা।

তাই সম্ভবত সুকান্তকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্রোহের গান রচনা করতে হয়নি। সুকান্ত সচেতন মনে চায়ও নি।

'রানার' কবিতায় আছে কবির-আত্মার যোগ। রানার কবি যেন স্বয়ং। 'এই রানার কবিতায় ত্রিস্রোতের সমাহার ঘটে'—সুর, কণ্ঠ, নৃত্য।

সুর—সলিল চৌধুরী

কণ্ঠ—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

নৃত্য—শম্ভু ভট্টাচার্য।

সুকান্তর কবিতা গানে-নাচে পায় বিশ্বরূপ!

গণ-আন্দোলনে বা গণ-জাগরণে গান হয় মোক্ষম অস্ত্র! জনগণের হৃদয়ের গভীরে স্থায়ীভাবে আঘাত-দেওয়ার বা স্থায়ী রূপাবয়বে বসে থাকার একমাত্র অবলম্বন গান।

প্রসঙ্গত স্মরণে আসে সুকান্তর রচনা-করা ছড়াগুলির কথা। ছড়াগুলির বাইরে হাসি, ভিতরে গম্ভীর, শাসন-তর্জনে ক্রুদ্ধ, শ্লেষে দীপ্ত আর একটি বিশাল মুখ। এমন ছড়ারও রঙীন রূপ মেলে গানে।

সুকান্তর ছড়া-গান একই সঙ্গে রঙ্গ-কৌতুক ও রাজনৈতিক চেতনায় মিশ্রিত এক ভিয়েনে চাপানো অভিনব গদ্যবস্তু—যা শ্রোতার কানেও আনে 'মিঠে-কড়া' ভাব।

সুকান্তর ছড়ায় আছে বাংলা গানের নতুন বিষয়, নতুন রূপ।

'বন্দেমাতরম্' গান, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল, অতুলপ্রসাদ—এমন সব কবির গান জনগণের মধ্যে থেকেই আজ শাশ্বত। দেশের স্বাধীন সত্তার অভ্যুদয়ে, দেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাদানে এঁদের গান ছিল গণসংগীত, কিন্তু সেই গণজাগরণের সংগীত হল অতীত দেশীয় ঐতিহ্যের পটভূমিতে মানুষের দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য বোধ জাগরণের সঙ্গীত।

এঁদের মধ্যে নজরুল এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক! বিদ্রোহের গানে

নজরুল গণসংগীতের সূত্রপাত ঘটালেন। 'গাহি সাম্যের গান'—এমন সব ঘোষণার মধ্য দিয়ে নজরুল আবেগদীপ্ত গণসঙ্গীতের সূচনা ও পথ রচনা করে দেন।

আসে অন্তঃশীল স্রোতের মত দ্বিতীয় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির সময়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফরের প্রভাব, অসহযোগ আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ—এসবের মধ্যেই সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা মোড় নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে গণজাগরণ নতুন তাৎপর্য নেয়। কারণ দেশীয় কংগ্রেসের নানান আন্দোলনের পাশাপাশি 'নবজাতক' সাম্যবাদী আন্দোলন ও চিন্তাধারার বিস্তার।

অচিরেই দেখা দেয় জাগ্রত জনচেতনার স্বাক্ষর 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' ও 'গণনাট্য সংঘ'। দ্বিতীয়টি প্রথমটির মধ্যে থেকেই জাত এক নতুন ধারার সাংস্কৃতিক অংগ।

এই শাখার পক্ষে গণসংগীতের বিস্তার ও প্রচার সেকালে এবং একালেও স্মৃতিসূত্রে বিস্ময়কর।

এই গণনাট্য সংঘের সূত্রেই দেখা দেন অসংখ্য কবি, গায়ক, সুরকার, চিত্র-শিল্পী, অভিনেতা ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, শম্ভু মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত প্রমুখ।

কিশোর কবি এঁদের মধ্যেকার এক অগ্নিদীপ্ত কবিপ্রাণ।

কিন্তু সুকান্ত সচেতনভাবে গণসংগীত রচনা করেনি, তবু তার কবিতা গাওয়া হয় বহু সভায়। 'জনযুদ্ধের গান' সেরকম এক কবিতা।

'জনযুদ্ধের গান' কবিতাটি গানের সুরে গাওয়ার ব্যবস্থা করে সে সময়ের 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'।

'উদ্যোগ' কবিতা, 'অভিযান' গীতিনাট্য, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত 'সূর্যপ্রণাম' গীতিকাব্য অভিনয়ের সময় গানগুলি সুরে মূর্ছনায় অপূর্বত্ব পায় সে সময়।

'অভিযান' গীতিনাট্যের প্রথম গান—

ক্ষুধিতের সেবার সব ভার
লও লও কাঁধে তুলে—
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাদরে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।

এমন গানের চরণে প্রখ্যাত গণ-সংগীতকার ও গায়ক বিনয় রায় গণনাট্য সংঘের দলের তরফে যে সুরেলা কণ্ঠ দিতেন, তা সুকান্তর কবিতার ও গানের গণসংগীত-ধর্মকে মহৎ মূল্যে উজ্জীবিত করে দেয়!

সুকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্তর কবিতাকে এক নতুন মোড় ফেরানো গণসংগীতের সার্থক এবং প্রথম মর্যাদা দেন সুরকার সলিল চৌধুরী। সলিল চৌধুরীর সুরেই কবি সুকান্তর গণসংগীতকার সুকান্ত হিসেবে নবজন্ম লাভ!

কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল (আমরা এসেছি)
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি। (অনুভব / ১৯৪০)
'বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে।' (অনুভব / ১৯৪৬)
বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি (বিদ্রোহের গান)
ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু (ঠিকানা)
হে সূর্য! শীতের সূর্য (প্রার্থী)

এমন সব কবিতার চরণে, 'একটি মোরগের কাহিনী', 'বোধন' 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', এমনকি 'লেনিন'-এর মত কবিতাতেও গানের সুর প্রবাহিত করে সুকান্তর কবিতাকে যেভাবে গণসংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়, তা গীতিকার সুকান্তকে সম্যক স্বীকৃতি দেওয়ার সফলতম প্রয়াস।

বাংলা গানে সুকান্তর কবিতা শুধু স্মৃতি নয়, শুধু সম্মান নয়, চিরকালের রক্ত-চঞ্চল-করা, মহৎ প্রাণে উজ্জীবিত করার মত জনগণমনের অসীম সুর ও বাণীও!

সুকান্তর কবিতায় আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক দিক, সেই সঙ্গে ওতপ্রোত নান্দনিক দিকও! এই নান্দনিক দিকের পরিচয় কবিতার সুরকারের সুরে ও গায়কের কণ্ঠে গান হয়ে-ওঠার মধ্যেই!

গান ও কবিতার মধ্যে যে একালের মত আমেরু বিভাজন রাখা ভুল—সুকান্তর গণসঙ্গীত তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

সুকান্তর কবিতা নিঃসন্দেহে স্বয়ংসম্পূর্ণ গান, আবার সুকান্তর গান সুকান্তর লেখনী-নিঃসৃত কবিতারই স্বতন্ত্র ধারার কবিতা!

সুকান্তর কবিতা সর্বকালের, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যকার অন্তঃশীল সংগীত-স্পন্দকে অবলীলায় জাগিয়ে দেয়। এখানেই আছে একেবারে নতুন ধারার গণসঙ্গীত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সুকান্তর কবিতার প্রকরণ

সুকান্তর কালে সুকান্ত স্বয়ং এক গভীর বিস্ময়!

বিস্ময় তার স্বাতন্ত্র্যে, সংগে সংগে রবীন্দ্র-আনুগত্যেও।

বাংলা কাব্যধারায় সুকান্তর আগের কবিরা যে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে উৎসাহী, সুকান্ত সেদিকেই গভীর নিবদ্ধ!

সুকান্তর অগ্রজ কবিদের কাল প্রাক দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় বা দশক! এ সময়ে রবীন্দ্র প্রতিভা যেন 'পরিণত বৎসরের ফল'! সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন স্বরাজ্যে স্বরাট। তাঁকে জয় করে তাঁকে অতিক্রম করার সাহস ও ক্ষমতা তখনো রবীন্দ্র-অনুজ অথচ সুকান্ত-অগ্রজদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবু সুকান্ত-অগ্রজরা তাঁদের কাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ছিলেন তৎপর, সজাগ, সতর্ক! এমন সচেতনা ছিল কাব্যবিষয়ে যতটা, তার থেকেও বেশী কাব্য-প্রকরণে!

সে সময়ে কাব্যধারায় প্রকরণগত তাৎপর্য নির্ণয়ে সুকান্ত-অগ্রজরা রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে এক অন্য জায়গায়, বলা ভাল, অন্য পথে চলার প্রয়াসে উন্মুখ। তাঁদের খেদোক্তি—'পথ রোধি রয়েছেন রবীন্দ্র ঠাকুর!'

অনুজ সুকান্তর সে ক্ষেত্রে নির্দ্বিধ রবীন্দ্র-নিষ্ঠা বিস্ময়কর।

অথচ অগ্রজ কবিদের থেকেও সে সময়ের বাংলা কাব্যধারায় সুকান্তর কবি-ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র।

এখানেই সেই গভীর বিস্ময়।

সবল কোন বিরোধিতা নয়, সানুনয় আনুগত্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে সুকান্তর কবিতা রচনা! এ যেন ঈশ্বরমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বেলে উত্তরণের মন্ত্রোচ্চারণ! নাকি শপথ-বাক্য গ্রহণ?

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,

আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।

'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কনিষ্ঠ কবির এই যে আকুল আর্ত প্রার্থনা, এ কি শুধু রবীন্দ্রপূজার, বন্দনার বা ভক্তির বিলাস? না, বিশ্বকবিকে সঙ্গে রেখে দুঃসাহসে দীপ্ত হয়ে নতুন কবিতা রচনার বাসনা প্রকাশ? আশীর্বাদ কামনা?

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক সর্বকালের কাব্যের ও কবি-ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি।

সুকান্ত-অগ্রজ কবিদল রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশকে স্পষ্ট বিদ্রোহ দিয়ে কাব্যধারায় লেখনী চালনা করেন।

অনুজ সুকান্ত যে বিদ্রোহ করেনি, প্রমাণ শুধু বিষয়-ভাবনায় নয়, তার কবিতার শরীরেও। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতার যে ছন্দ, যে শব্দগ্রন্থনা, যে চরণ বিন্যাস—সবই যেন রবীন্দ্র সম্পদ দিয়ে সশ্রদ্ধ রবীন্দ্র প্রণাম!

সুকান্ত রবীন্দ্র-সংলগ্ন কনিষ্ঠ কবি! রবীন্দ্র-মগ্ন বলিষ্ঠ কবিও!

রবীন্দ্র-সংলগ্নতা বা মগ্নতা কত গভীর, রবীন্দ্র নাম নামাবলীর ওপর লিপিকৃত হরিনাম-এর মত কত পুণ্যময় রূপ পেয়েছে যে সুকান্তর কবিতায়, তার আর এক প্রমাণ 'প্রথম বার্ষিকী' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে বাইশে শ্রাবণ মনে আসে কনিষ্ঠ কবির। বিশ্বকবির প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী!

একদা শ্রাবণ দিনে গভীর চরণে,
নীরবে নিষ্ঠুর সরণিতে
        পাদস্পর্শ দিতে
                ভিক্ষুক মরণে
পেয়েছ পথের মধ্যে দিয়েছ অক্ষয়
                তব দান
        হে বিরাট প্রাণ।
তোমার চরণ স্পর্শে রোমাঞ্চিত পৃথিবীর ধূলি—
        উঠেছে আকুলি',

আজিও স্মৃতির গন্ধে ব্যথিত জনতা
কহিছে নিঃশব্দ স্বরে একমাত্র কথা,
"তুমি হেথা নাই"।

এমন সব চরণে স্পষ্টত বিশ্বকবির 'বলাকা'র অন্তর্গত কবিতার সঙ্গে কবি সুকান্তর অন্তরশায়ী আত্মীয়তা লক্ষ্য করার মত। অন্ত্যমিল— 'চরণে', 'মরণে', 'সরনিতে' 'দিতে', 'দান' 'প্রাণ'—এসবের মধ্যে, 'হে বিরাট প্রাণ' এমন চরণের শব্দগুচ্ছ সাজানোয় ও ধ্বনিময়তা সৃষ্টিতে, 'রোমাঞ্চিত পৃথিবীর ধুলি / উঠেছে আকুলি'-র মধ্যেকার ভাবপ্রকাশে অনুজ কবির কাব্য-প্রয়াস পঞ্চপ্রদীপের শিখায় রবীন্দ্র-আরতির মত!

আর চরণ ও স্তবক বিন্যাস? সেই সংগে মিশ্রবৃত্ত মুক্তবন্ধ ছন্দের প্রবহমানতা? সবই যেন সুকান্তর বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়ে আসেনি এমন সব স্তবকে!

যেন সুকান্তর ওপর রবীন্দ্রছায়া মাপে হুবহু রবীন্দ্রনাথের মতই!

বৌদ্ধ জাতকে সেই সোনালি পাহাড়ের গল্পের ছোট পাখিদের সোনালি পাহাড়ের সোনা-রঙে নিজেদের রাঙিয়ে বেশকিছু কাল বাস করার মত!

এমন মন্তব্যের স্বপক্ষে আরও কবিতা। যেমন 'সূর্য-প্রণাম'-এর 'অস্তাচল' অংশে 'যাত্রা' শীর্ষক 'আবৃত্তি'তে—

অমৃত লোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন প্রস্থানের
পথে তোমার একাকী অভিযান।······

নশ্বর জীবন
অনন্তকালের তুচ্ছ কণিকার প্রায় হাসি ও ক্রন্দনে
ক্ষয় হয়ে যায় তাই ওরা কিছু নয়, তুমিও জানিতে,
'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান'
তবু তুমি শিল্পীর তুলিকা নিয়ে করেছ অঙ্কিত
সভ্যতার প্রত্যেক সম্পদ, সুন্দরের সুন্দর অর্চনা।

এমন সব কবিতায় মনে হয়, রবীন্দ্র-কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুজ কবির এমন কাব্যবচন!

কিন্তু সুকান্তর বিস্ময় রবীন্দ্রনাথে বদ্ধ নয়, রবীন্দ্র-স্বীকৃতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যেই। রবীন্দ্র-স্বীকরণ থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্যে অনুজ কবিমানসের উত্তরণ—তার মূলে অনুজ কবির কাল! নিশ্চয়ই কালচেতনা, কালসমগ্রতা!

সুকান্ত কালের ক্রীড়নক নয়, কালের কথক! সুকান্ত কালকে নিয়েছিল কর্মে, মর্মে। কাল তার আত্মা, তার নাড়ীর যোগে তার প্রসূতি। তাই কালের বিদ্রোহ, বিপ্লব, আন্দোলন সুকান্তর কবিতার একমাত্র মাটি, আশ্রয়, জীবন-রস গ্রহণের উপযোগী রসাধার। সুকান্তর কবিতার আকাশ, সবুজ গাছপালা, নদী, স্রোত—বিশাল পৃথিবী গড়ার উপযোগী সবকিছুই!

গুরু দ্রোনাচার্যের কাছে শিষ্য একলব্য!

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুজ কবি সুকান্ত!

গুরুকে অতিক্রম করার সাহস ও শিক্ষা তো গুরুর মধ্যেই! কবি সুকান্তর প্রবহমান রক্তচেতনায় ছিল তারই বিশ্বাস।

তাই সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথে নিবদ্ধ থেকেছে, চিরকালের বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেনি।

'ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় সে নিজেকে রবীন্দ্র-বলয়ে স্থপিত করেছিল।··· কিন্তু এই উচ্চারণের মধ্যে সুকান্ত আবদ্ধ থাকেনি। তার কাব্যের সমগ্র মূর্তি অন্যরকম। সেখানে মন্থরতা অথবা বিধুরতা কোণঠাসা, দৃঢ় সমৃদ্ধ শব্দে চিত্রে সেখানে ক্ষিপ্রতা ও দৃপ্ত আবেগ। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও সুকান্ত রাবীন্দ্রিক হয়নি।' (অরুণ মিত্র)

কাব্যের প্রকরণে সুকান্তর স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য যথার্থ। এবং প্রকরণ যেহেতু বিষয় বিবিক্ত কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে বিষয় ভাবনার বিশিষ্টতাতেই সুকান্তর কবিতার প্রকরণগত স্বতন্ত্র মর্যাদা গড়ে ওঠে।

সুকান্তর কবিতার বিষয়ের সংগে ঘনিষ্ঠ জড়িত শব্দ-সচেতনা, শব্দনিহিত ধ্বনি-গাম্ভীর্য।

কবিতার শরীরে শব্দ আর মানুষের শরীরে রক্ত-মাংস একই!

মানব শরীরের রক্ত-মাংস তো তার আত্মার, প্রাণের অন্যতম আশ্রয়, আধার। কবিতার শব্দও বুঝি তা-ই। কবিতার যা প্রাণ, তা রূপময় হয় শব্দের ধ্বনিতে, শব্দের চিত্রে, শব্দের সজ্জিত চিত্রকল্পে—যা কবিরই গভীরতম এক একটি অভিজ্ঞতার দান, আর শব্দের সীমাতীত ব্যঞ্জনায়।

কবিতায় শব্দের এমন গুরুত্বের কথা ভেবেই বুঝি মালার্মের মন্তব্য—'পোয়েট্রি ইজ রিট্‌ন্‌ উইথ ওয়ার্ড্‌স্‌ নট্‌ আইডিয়াস্‌'।

সিরিল কন্‌লি তো আরও গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেন—'লেখকের শব্দসম্ভার তার কারেন্সি'।

আমাদের দেশে প্রখ্যাত আলংকারিক কুন্তক বলেছেন—'বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গি ভনিতি' কবিতার অন্যতম সর্ত।

ভারতচন্দ্রের বিচার—'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।'

'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন' সেই কবি!—মধুসূদনের পরিষ্কার ব্যাখ্যা!

ওদিকে জেম্‌স্‌ বীট্‌ল্‌-এর কিছু কথাও মনে পড়ে! 'চিত্রকরের যেমন রঙ্‌, কবির তেমনি শব্দ।' আবার 'কবিতার শব্দ যোজনা হয় প্রথমত তার 'সেন্স'-এর জন্য; এবং দ্বিতীয়ত তার 'সাউণ্ডের' জন্য। সঙ্গীতে এর বিপরীত রীতি!'

সেসিল-ডে-লুই-এর ব্যাখ্যায়—'ওয়ার্ডস্‌ ফর্‌ মিউজিক্‌ আর লাইক্‌ ওয়াটার-উইড্‌; দে ওন্‌লি লিভ্‌ ইন্‌ দি স্ট্রিম্‌স্‌ এ্যাণ্ড এডিস্‌ অফ্‌ মেলডি।'

এমন সব গভীর-গম্ভীর চিন্তা-ভাবনা ও মন্তব্য কবিতার শব্দ ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

কিন্তু কবিতার শব্দ কবিতার বিষয়-বিবিক্ত নয়, অন্যদিকে কবিতার বিষয়ও তার দেহ-অলংকৃত শব্দকে অস্বীকার করে দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। কাব্যপাঠে কবিতার আত্মার উন্মোচন তার বিশুদ্ধ রসের তথা অমলিন আনন্দের উদ্বোধন। সে ক্ষেত্রে কবিতার শব্দ তার লাবণ্য, তার বিস্ময়সৃষ্ট প্রকাশের ছাড়পত্র!

যদি হাউসম্যানের কথাই সত্য হয়—'ইট ইজ দি ফাংশান অফ দি

পোয়েট টু হার্‌মোনাইজ দি স্যাড্‌নেস্ অফ দি ওয়ার্লড্', তবে কবিতায় এমন শব্দসমূহের দায়িত্ব 'হারমোনিজেশান্'-এর পক্ষে অনস্বীকার্য।

কবি সুকান্তর শব্দ-সচেতনা তার শুধু প্রকরণ চাতুর্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, কবিতার সবল, কালানুগ বিষয়-ভাবনার সংগে ছায়া-কায়া সম্পর্কে নিবিড়, নিগূঢ়। মাংস থেকে রক্তের সম্পর্ককে যেমন কোন-ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ, অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব সুকান্তর কবিতা থেকে শব্দের সম্পর্ককে স্বতন্ত্র করে দেখার।

সুকান্তর অব্যবহিত আগের কালে বা দশকে অগ্রজ কবিদের মানসিকতা কি রকম?

'দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে, সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম।' 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এটি একটি সুচিন্তিত বিশ্লেষণী ভাষণ!

এ ক্ষেত্রে সুকান্তর কবিতায় বিপরীত ভাবনা সম্ভবত তারই প্রতিবাদ! সেখানে বিলাস-বর্জিত দুঃখ আছে, আর সেই বিলাসবিহীন দুঃখ রক্তিম রূপ নিয়েছে বিদ্রোহে, জ্বালায়, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, সর্বকালের মানবিক বোধ ও বোধির পরিশীলিত রূপাবয়ব রচনার অঙ্গীকারে!

তাই সুকান্তর কাবতার প্রকরণ-ভাবনা তার বিষয়-ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত শরীরী-অস্তিত্বই।

যে কোন ক্ষেত্রেই বিলাস আনে মন্থরতা, আতি, আলস্য! কল্লোলের কবিদের তত্ত্ব-সর্বস্ব কাব্য বিলাসে এগুলি উপসর্গ।

সুকান্তর কবিতা এসবের মূলেই সবল অমোঘ এক কুঠারের আঘাত! আর, আঘাত করার সর্তই হল আবেগদীপ্তি, উচ্চকণ্ঠ, ক্ষিপ্রতা, প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে সবলে আঘাত দেওয়ার তীব্র বাসনা!

সুকান্তর 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় কবির কণ্ঠ যখন উচ্চ স্বরগ্রামে বেজে ওঠে—

> আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
> প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিছবি।
> আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,

আমায় বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃংখল দুই হাতে।

তখন রবীন্দ্র-ভাবিত মিশ্রবৃত্তের ধীর চরণের গম্ভীর প্রবহমানতার মধ্যেও কিশোর কবির শব্দ সাজানোর ও শব্দগুলিকে পরিবর্তিত ভাবের উপযোগী আবেগদীপ্তি দেওয়ার মধ্যে সুকান্তর মানস-বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে আবেগের জন্ম, সেই আবেগেই সুকান্তর কবিতার শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প আর ভাষাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য! সুকান্তর কবিতার শব্দ এবং চিত্রকল্প তার গভীরতম অভিজ্ঞতার ফল!

মার্জোরি ব্যুলটনের মন্তব্য: 'দি পোয়েট চুজেস্ এ্যান্ ইমেজ্ টু এক্সপ্রেস্ হিজ্ ওন্ এক্সপিরিয়েন্স ফর্ হিমসেল্ফ্…'।

সুকান্তর শব্দপ্রাণতা, চিত্ররচনার স্বতঃস্ফূর্ততায় এরই প্রমাণ। আবেগের তীব্রতা আর উপলব্ধির গভীরতা ছিল বলেই তো সুকান্ত 'অনুভব ১৯৪০'-এর মত কবিতায় উদাত্ত গম্ভীর গানের শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছে—

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি।
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।

'অবাক' শব্দটা একই চরণে দু'বার দমক দিয়ে ব্যবহার করার মধ্যে, পরবর্তী চরণগুলিতে একাধিকবার একই লক্ষ্যের বিভিন্ন তাৎপর্যে প্রয়োগের মধ্যে যে নিশ্চিত আবেগ, যে সহজ প্রবহমানতা ও ধ্বনিময়তা—তা সুকান্তর কবি-আত্মার খাঁটি উপলব্ধিজাত! কবিতাটি অদ্ভুত সব শব্দার্থের ও তন্নিহিত কবির লক্ষ্যে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়! ক্ষোভ, ক্রোধ, অন্নহীনতার জ্বালা ও অসহায়তা, মৃত্যু-চিন্তা, রক্তদান—এসব শব্দের ভাবে সেই সিঁড়ির ধাপ! আর কবিতার সর্বশেষ!

এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম!

কবিতাটির শেষ ধাপ 'পদাঘাত'। এবং শেষতম চরণের 'সেলাম' অর্থাৎ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেওয়ার মধ্যে তীব্র শ্লেষ। এমন রীতিতে কবিতা লেখা সুকান্তর একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি।

'অনুভব ১৯৪৬'-এর মধ্যেও সেই রীতি।

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;

প্রথম চরণে দু'বার 'বিদ্রোহ' শব্দ প্রয়োগে বক্তব্যকে যেভাবে সোচ্চার করার প্রয়াস, কবিতার শেষতম চরণে—'বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারিদিকে॥' রচনার মধ্যেও সেই সোচ্চার কণ্ঠের স্বাভাবিক প্রকাশ।

'নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট'

এমন চরণ ব্যবহারের সংগে সংগেই আসে কবির প্রিয় চিত্রকল্প—

'রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।'

লক্ষ্য করার মতো, কলাবৃত্তের ধ্বনির সাবলীলতা ও যুক্তাক্ষরগুলিকে বিদ্রোহের উতরোল স্বভাবের অনুগ করায় কবির সহজ দক্ষতা।

এমন সহজাত দক্ষতা এত কম বয়সের কিশোর কবির মধ্যে দেখা দেয় কি ভাবে? এক: ছন্দের কান, দুই: কবির একাগ্রচিত্ততা—দু'টির মিলিত রূপের পরিচয় কবির ভাষার ঔজ্জ্বল্যে আর চিত্ররচনার রঙে।

সুকান্তর কবিতায় নানান ছবির শরীর-স্বভাব এমন একাগ্রচিত্ততার কারণেই।

'আগ্নেয়গিরি' কবিতায় সুকান্ত লেখে:

তোমার আকাশে ফ্যাকাশে প্রেত আলো;

এখানে 'আকাশে' শব্দের পাশে 'ফ্যাকাশে' শব্দ প্রয়োগে কোন পরিকল্পনা ছিল না সুকান্তর। অথচ অনুপ্রাসের ধ্বনি আর ভয়াল চিত্রের রঙ—দুই মিলে একাকার।

মধুসূদন তাঁর কবিতায় বহু জায়গায় নাম জাতীয় বিশেষ্যকে ক্রিয়ার রূপ দিয়ে কবি-প্রাণের আকূতি ও অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে গেছেন। সুকান্তর কবিতায় আছে বহু বিশেষ্যকে বিশেষণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বা

ক্রিয়ার সচলতায় দীপিত করার প্রয়াস। আবার বিপরীতে বিশেষণকে বিশেষ্যের মধ্যে টেনে এনে শব্দের সংক্ষিপ্তি দানের চেষ্টাও কম নয়।

'বিদ্রোহের গান' কবিতায় সুকান্ত লেখে :

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌছাক দ্বারে ;
ভীরুরা থাক।

এই যে 'ভীরুরা'—এ প্রয়োগ সুকান্তর নিজস্ব। এর বদলে 'ভীরু ব্যক্তিরা' লিখলে নিশ্চয়ই কলাবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিতে পতন ঘটত না, তবু সংক্ষিপ্ত করে শুধু 'ভীরুরা থাক' বলার মধ্যে যেমন বিশেষণকে বিশেষ্য করার চিন্তা আছে, তেমনি আছে সমস্ত ভীরু ব্যক্তিদের উদ্দেশে বিদ্রোহের দিনে শ্লেষ দিয়ে তাচ্ছিল্য করার গোপন বাসনা।

সুকান্ত যখন লেখে :

এক : বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি (আঠারো বছর বয়স)
দুই: হীন সর্বহারা ধূর্তের মত শক্তিশেলে (প্রস্তুত)

তখন 'বিরাট দুঃসাহসেরা', 'হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মত' শব্দগুলির বিশেষ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষণে অন্য ব্যঞ্জনা আনে।

সুকান্তর কবিতার প্রকরণের আর এক বিশিষ্টতা কবিতার অন্তিম চরণ রচনার মধ্যে।

এক: বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন (লেনিন)
দুই : তারপর হব ইতিহাস (ছাড়পত্র)
তিন : আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি॥ (আগ্নেয়গিরি)
চার : ঠিকানা রইল.
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা কোরো॥ (ঠিকানা)
পাঁচ : আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।
(চট্টগ্রাম-১৯৪৩)
ছয় : অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥ (একটি মোরগের কাহিনী)

সাত : শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে ॥ (১লা-মের কবিতা '৪৬)

এমন বহু চরণ দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে সুকান্তর আবেগের তীব্রতা স্থির সিদ্ধান্তে স্থিত হয়ে যায় শেষতম এক বা দুই চরণে। সেখানেই কবিতার প্রতিপাদ্য, কবির লক্ষ্য, কবির জিজ্ঞাসাও!

অনেক সিদ্ধান্তে সুকান্তর স্বয়ং উপস্থিতি, কোথাও বা ঘুরিয়ে পরোক্ষে আঘাত হানার প্রয়াস, কোথাও আবার ছোটগল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় একটি সামগ্রিক চিত্রকল্পকে প্রতীক প্রতিম করে তোলার প্রয়াস!

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌, কোলরিজ, শেক্সপীয়র, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বেশ কিছু চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন যেগুলিতে তাঁদের নিজস্বতা স্পষ্ট হয়। সুকান্তর সেরকম নিজস্ব চিত্রকল্পও কিছু ছিল। বহু কবিতায় 'রক্ত'-কে প্রতীকী করেছে সুকান্ত। সে সময়ে সমস্ত সাম্যবাদী চিন্তাধারায় দীক্ষিত কবি-শিল্পীদের পক্ষে রক্ত পতাকার পাশে রক্তকে প্রতীক প্রতিম প্রয়োগ যেনবা আত্মার আত্মীয়তায় দেখা দিত। সুকান্ত তারই উত্তরসূরী এক কবি।

শুধু 'রক্ত' নয়, 'স্বপ্ন' ইত্যাদি কিছু শব্দ সুকান্তর কবিতার নির্দিষ্ট শরীরে গাঁথা অলংকার হয়েই থেকে গেছে!

সুকান্তর ব্যক্তিজীবন দস্তয়ভ্‌স্কির জীবনের মত অস্থির, চঞ্চল, বিচিত্র ঘটনায় প্রবাহিত জীবন। সুকান্ত সে সব কিছুর মধ্যে স্রোতের গতিতে ভাসা খড়কুটোর মত। বয়সে কিশোর, অভিভাবকহীন হয় অল্প বয়সেই। পিতার ব্যক্তিত্ব তার একান্ত আপন এক নির্জনতা গড়ে দেয় চারপাশে।

তবু সুকান্তর কুড়ি বছরের সমস্ত কর্মতৎপরতা তারই একান্ত নিজস্ব। সেই কর্ম তাকে কবি করে তোলে। তাকে গদ্য লেখক, গল্প লেখকও করতে পারত! সুকান্তর 'একটি মোরগের কাহিনী', 'কলম', 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি' এবং 'মিঠে কড়া'র বেশ কিছু কবিতা যেনবা এক গল্পরসিক ও গল্পলেখকের কলমে লেখা!

কবিতার মধ্যে গল্পরস, চরিত্র, ঘটনা, পরিণামী ব্যঞ্জনা!

গল্পের অবসরে বা ছায়ায় কবিতার সূক্ষ্ম শরীরে পদচারণা! কর্মী সুকান্তর মর্মলোক কবি সুকান্তর পাশাপাশি গল্পকার সুকান্তকে একাকার করে দেয়। এই ধারার কবিতা যেনবা সম্পূর্ণ এক একটি প্রতীক।

একদা কথাসাহিত্যিক 'বনফুল'-এর হাতে পাওয়া যায় আকারে সংক্ষিপ্ততম গল্প!

কবি সুকান্তর কবিতায় সেই সংক্ষিপ্ততম গল্পেরই ছায়াঘন উপস্থিতি। এই ধারার কবিতা তাই সুকান্তর প্রকরণ স্বাতন্ত্র্যে এক বিস্ময়!

সুকান্তর কবিতার ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে কবি-সমালোচক অরুণ মিত্রের কিছু মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান :

'তার একমুখী আবেগকে বহন করবার জন্যে সুকান্ত ব্যবহার করেছে অল্প কিছু গদ্য ছাড়া অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। তবে এ দুয়ের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের প্রতিই তার পক্ষপাত। বোধ হয় তার মনের ক্ষিপ্রবেগ এবং অস্থির অনুভূতি সহজে প্রকাশ করার পক্ষে এই ছন্দ বেশী উপযোগী ছিল বলে। এমনও দেখা যায় যে, এক কবিতারই বিভিন্ন অংশে যখন সে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, এবং গদ্য পংক্তি ব্যবহার করছে, তখনো সে ফিরে ফিরে আসছে মাত্রাবৃত্তে এবং বৈচিত্র্য আনছে ঐ ছন্দেরই অংশে। দৃষ্টান্ত 'বোধন'। কখনো বা সে অক্ষরবৃত্ত দিয়ে আরম্ভ করে শেষ করে মাত্রাবৃত্তে। যেমন, 'সেপ্টেম্বর, '৪৬'। কখনো বা দেখি, একই কবিতা ভাঙা গদ্যে লিখে তার তৃপ্তি নেই, সেটি আবার লেখে মাত্রাবৃত্তে। যথা, 'কাশ্মীর'। এই ঝোঁকের এক ব্যতিক্রম 'কলম', যেখানে মাত্রাবৃত্ত থেকে অক্ষয়বৃত্তে যাওয়া।

'মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার এবং বক্তব্যের প্রত্যক্ষতা স্বাভাবিকভাবেই দু'এক সময় সুকান্তকে নজরুলের সমস্বরে নিয়ে গিয়েছে। যেমন :

> শোনরে বিদেশী, শোন,
> আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ!
> আমরা সবাই অসভ্য বুনো—
> বৃথা রক্তের শেষ নেব দুনো

এক পা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর
আমরা করেছি পণ,
ঠ'কে শিখলাম—
তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন। (একুশে নভেম্বর, ১৯৪৬)

'যেখানে সুকান্ত মন ও হৃদয়কে এক করে তার সহজাত ক্ষমতায় সরাসরি কথা বলে, সেখানে সে সবচেয়ে সার্থক। সেখানে তাকে বিশিষ্টভাবে চেনা যায় এবং তার অনুভূতি ও বক্তব্যের অভিঘাতে আমরা আলোড়িত হই। সেখানে শব্দ ও ছবি ডালপালা থেকে মুক্ত হ'য়ে ছন্দের গতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যদি কিছু বাহুল্য থাকে তা গৌণ হয়ে যায়। এ রকম সার্থক কবিতা সে কম লেখেনি। যথা, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, লেনিন, অনুভব, শত্রু এক, হে মহাজীবন, অনন্যোপায়, কবিতার খসড়া, রৌদ্রের গান, উদ্যোগ···ইত্যাদি' (সুকান্ত-কাব্যের ভাষা ছন্দ ছবি)।

কবিতার সযত্ন সাহসী প্রকরণে সুকান্তকে প্রাণিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ! সুকান্তর শিক্ষা, ভাবনা সহজ ভাবে ও প্রাণেই গ্রহণ করে. অন্তরঙ্গ করে নেয় রবীন্দ্রনাথকে। অগ্রজ ও কবিশ্রেষ্ঠ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণে কোন অন্যায় নেই, ছোট-হয়ে যাওয়াও সুকান্তর মত একজন অনুজ কবির পক্ষে নেই।

সুকান্ত নজরুলকে গ্রহণ করে কাব্যের ছন্দে, কিছু শব্দে এবং বিদ্রোহের ভাবাবহ রচনায়!

আমার মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ ভাবনা এবং সেই সূত্রে শব্দ প্রয়োগও সুকান্তকে অগ্রজ কবির প্রতি অলিখিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সহায়তা করে, তা না হলে 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতার প্রথম দুই চরণের পরেই কি করে সুকান্ত লেখে :

এসেছে; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।

এই দুই চরণের পাশাপাশি রাখি সত্যেন্দ্রনাথের 'গান্ধীজী' কবিতার প্রথম দুই চরণ :

দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী কি লিখিস হিজিবিজি ?

নগরের পথে ওঠে রোল ওই গান্ধীজী, গান্ধীজী ।

'হিজিবিজি' ও 'গান্ধীজী' শব্দযুগ্ম দিয়ে দুই চরণের অন্ত্যমিল রচনার প্রয়াস ও গান্ধীজীর প্রতি ভক্তিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রয়াস দুই কবির যেন বা এক । সত্যেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ, সুকান্ত কনিষ্ঠ। দুজনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কাব্যিক ভাষায় ছন্দরীতি এক—কলাবৃত্ত ছন্দ !

সুকান্তর কবিতার মূল লক্ষ্য সমস্তরকম শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল, সরব বিদ্রোহ, আঘাত হানার অমোঘ, নির্দয়, আপোষহীন বাসনা ।

এই বক্তব্য প্রকাশে সুকান্তর ভাষা আবেগকম্পিত, শব্দ ছন্দের স্পষ্ট কানে যাচাই করা—অনেকটা এ্যাসিডে গলানো সোনার মতো, চিত্রকল্প কবির রক্তক্ষয়ী বাসনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে রঙ করা জীবন্ত শরীরের মত। সুকান্তর কাব্যপ্রকরণ তার নিজস্ব। রবীন্দ্র প্রণাম দিয়ে শুরু, বিস্তার, রবীন্দ্র-স্বাতন্ত্র্য দিয়ে তার সিদ্ধান্ত, সমাপ্তি। এই স্বাতন্ত্র্যের সূত্র দিয়েই থেকে গেছে, বিস্তারে, ব্যাখ্যায়, পরিণতিতে তা পৌঁছতে পারেনি ।

এক বিশাল সময়ের শেষে বিশাল প্রাচীনতম শাল বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ। আর এক বিশাল সময়ের শুরুতে ছোট নবীন অশ্বত্থ গাছের চারার মত কবি সুকান্ত। বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় মায়ের কোলে শিশুর মত তার প্রতিপালন ।

কবি-শিশুর কৈশোর শেষের অকাল মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত, নির্বাক, হতবুদ্ধি !

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলা কাব্য-ঐতিহ্য ও কবি সুকান্ত

উনিশ শ চল্লিশ থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের মধ্যবর্তী সময়—সুকান্তর সার্থক কবিতা রচনার একমাত্র কালসীমা!

উনিশ শ একচল্লিশে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, উনিশ শ' সাতচল্লিশে সুকান্তর আকস্মিক অকাল মৃত্যু!

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ বাংলা কাব্যসাহিত্য ধারায় শুধু নয়, এক মহত্তম সংস্কৃতির—যা সমগ্র বিশ্বেরও—তার ছেদচিহ্ন পড়ে যায়।

তিরিশের দশকে কল্লোলের লেখকদের আধুনিকতার সরব ঘোষণা! এদের চারপাশে বিশাল পাহাড়ের মত রবীন্দ্রনাথও আধুনিকোত্তম চিন্তাধারায় সমান সক্রিয়।

অথচ এ সময়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই কথাই আবার স্মরণ করতে হয়ঃ

'দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে, সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম।' (কল্লোল যুগ)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আর ভারতের স্বাধীনতা লাভ—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী কাল বাংলাদেশ তথা ভারতের পক্ষে এক অস্থিত অবস্থার কাল! অস্থিত অবস্থার স্বরূপ স্পষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর হাহাকার, বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণবিক্ষোভ, গান্ধীজীর ভারত ছাড় আন্দোলন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানান চড়া রঙের উচ্চকিত ঘটনায়।

এই অস্থিত অবস্থা যেনবা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় নামার মত।

এমন 'ডেকাড্যান্ট'-এর সময়েই যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মত অবধারিত 'ভ্যাকুয়াম' তৈরী হয়!

'নেচার এ্যাভর্‌স্‌ ভ্যাকুয়াম্‌'—এই তত্ত্বেই কি সুকান্তর আবির্ভাব ঘটেছে এই সময়ে ?

এই প্রশ্ন সূত্রেই আসে সুকান্তর সঙ্গে বাংলা কাব্যধারার, দেশের ঐতিহ্যের যোগ প্রসঙ্গ। সুকান্ত শুধু কি 'ভ্যাকুয়াম্‌' পূরণের কবি ? নাকি, তার শিকড় উত্তরাধিকার সূত্রেই গজিয়ে ওঠা ?

আবার সেই পুরনো কথা মনে আসে !

কবি সুকান্ত কালের ক্রীড়নক নয়, কালের ভাষ্যকার !

কিন্তু আগের কাল আর পরবর্তী সময় সমানভাবে তাকে ধরে রেখেছে। সুকান্ত কালোত্তীর্ণ, কিন্তু দুই দিকে দুইকালের মধ্যবর্তী সংযোজক এক কবি-ব্যক্তিত্ব। সুকান্ত যেনবা অর্জুন—তার দুই হাত দুই দিকের দুই কাল !

কবি সুকান্ত যেন সেই মহাভারত বর্ণিত সমদ্র মন্থনের সুবিশাল পর্বত। কাল সেই পৌরাণিক সর্প যা দিয়ে পর্বত-রূপ কবি সুকান্তকে বেষ্টন করে মন্থন করে গেছে জীবন-সমুদ্র ! কালের নিয়ন্ত্রণে সুকান্তর হাতে এসেছে শিব-অশিব দুই মূর্তির নানারূপ। একদিকে অত্যাচারী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, আর একদিকে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কামনা-কল্পনা, একদিকে শাসন-শোষণ আর একদিকে নবজীবনের বোধন ! একদিকে বিষ, আর একদিকে অমৃত ! একদিকে লক্ষ্মী, আর একদিকে সমস্ত রকম অমঙ্গল ! সুকান্ত নীলকণ্ঠের মত তার কর্মে, ঘর্মে, মর্মে জীবন সম্পৃক্ত করে কবিপ্রাণে গরল নিয়ে আত্মিক মুক্তির রসকে অমৃত-রূপে পরিবেশন করে গেছে বিখ্যাত সব কবিতায়।

বস্তুত কবি সুকান্ত পূর্বসূরী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কবিসত্তা নয় !

কবি সুকান্ত সমকাল থেকে ছিন্ন দুঃখের বিলাসে মত্ত কোন বিলাসী কবি নয়।

কবি সুকান্ত উত্তরকালের কাছেও কোন উল্কার বেগে ছিটকে আসা আলোক স্তম্ভ নয়—যা পরমুহূর্তেই বিলীন হয়ে গেছে উত্তর কালের বিস্ময় ও বিস্মরণের মধ্যেই !

সুকান্তর জীবনে, কবিতায় ঐতিহ্য-ভাবনা ওতপ্রোত !

সমস্ত রকম সংস্কার মুক্ত মন এবং সেই মন নিয়ে জীবন, জগত, কর্ম, ধর্ম, মর্মকে দেখানো, মানুষকে বিচার করার শিক্ষা সুকান্ত পায় তার পারিবারিক জীবনেই! মাতামহের মানসিক উদারতার শিক্ষা সুকান্তর জীবন-ঐতিহ্যের ধারক। এমন উদারতার শিক্ষাতেই সে কবির আবেগে রাজনীতি গ্রহণ করে সাম্যবাদের।

সুকান্তর কমিউনিস্ট হওয়া, বা একজন কমিউনিস্টের কবি হওয়া— একই চিন্তার এপিঠ-ওপিঠ, দুইদিক, দুইরূপ!

এ হল তার কালে হয়ে ওঠা!

কিন্তু এই হয়ে-ওঠা বালক বয়স থেকেই সম্ভব হয়েছে পারিবারিক শিক্ষার সূত্রে!

এখনো আমার মনে তোমার উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি।

রবীন্দ্র স্মরণের এমন ভাষায়, ছন্দে, আন্তরিকতায়, আবেগের মধ্যে পূর্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে সুকান্তর যোগ প্রমাণ করে দেয়।

রবীন্দ্র-কবিতা-প্রীতি সুকান্তর ঐতিহ্য-অনুসরণের অন্যতম এক সর্ত। 'প্রথম বার্ষিকী', সুকান্তর লেখা 'গীতগুচ্ছে', 'অভিযান', 'সূর্যপ্রণামে' সেই সর্তের স্বীকৃতি।

সুকান্তর কবিতা, মাঝে মাঝে মনে হয়, সাম্যবাদী ঐতিহ্যের বা রাজনৈতিক কবিতার ঐতিহ্যের পক্ষে 'পাইওনীয়র'—পথ-প্রদর্শক।

কবিতায় সাম্যবাদী তত্ত্ব বা রাজনৈতিক কবিতা রচনার প্রথম তত্ত্ব-ভাবনাজাত স্বীকৃতি সে সময়ের সুকান্ত-অগ্রজদের কবিতায় ছিল, ছিল নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কাব্য-প্রয়াসে। এদের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার নতুন আলো!

নজরুলের সাম্যবাদী ভাবনায় মার্কস্‌বাদের পরিশীলন ও স্বীকরণ ছিল না। তবু নজরুলের কণ্ঠে সাম্যবাদের সুর! এই সাম্যবাদ ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সৃষ্ট জাগতিক মানুষের মধ্যে বৈষম্যের ভাবনায় উপস্থিত।

সুকান্ত-অগ্রজ বিষ্ণু দে-র কাব্যের মধ্যে সাম্যবাদে দীক্ষাগ্রহণ ঘটে অনেক পরে অনেকটা কবিমানসের চিন্তাক্রমে নিরন্তর কবিতা চর্চায়;

মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার গভীরতায় উত্তরণে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'রুশতী পঞ্চসতী'র অভিজ্ঞতায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যজীবনের প্রারম্ভেই সাম্যবাদী কর্মী ও কবি। কবিতায় মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাস। কিন্তু তা একমাত্র হয়ে ওঠেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নানান সনিষ্ঠ পরীক্ষায় ও পরিশীলনে কবিতায় ও কবিব্যক্তিত্বে সাম্যবাদী হয়েও স্বভাবী পাঠকদের ভিন্নরূপ, ভিন্নস্বাদ দানে তিনি পারঙ্গম।

কিশোর-পুরুষ কবি সুকান্তর কবিতার সাম্যচেতনা অগ্রজদের সূত্রে আবদ্ধ থেকেও স্বতন্ত্র। সুকান্তর কবিতায় সাম্যবাদী ঐতিহ্য আবার রবীন্দ্র-ঐতিহ্যও! সুকান্ত এক অক্লান্ত কমিউনিস্ট কর্মী, আবার সমান ক্লান্তিহীন কবিও! সুকান্ত-অগ্রজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বীকৃতি : 'কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয়নি।'

রবীন্দ্র-ঐতিহ্য আর সাম্যবাদী ঐতিহ্য—দুই-এর গ্রহণে ও আত্মীকরণে সুকান্তর কবিতায় উজ্জ্বল ঐতিহ্যানুসণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ছন্দ, শব্দ আর সাম্যবাদের ব্যাখ্যা-বিস্তারে সুকান্তর কবিতায় স্পষ্ট ঐতিহ্যের প্রলেপ। সুকান্ত-স্বাতন্ত্র্য তার একই সংগে কর্মী ও কবি হওয়ায়, কালকে কর্ম, ঘর্ম, মর্ম দিয়ে গ্রহণ করার কারণেই স্পষ্ট।

অগ্রজ কবি নজরুলের বিদ্রোহের ঐতিহ্যও কিছুটা সুকান্তর মধ্যে! কবি সুকান্তর বিদ্রোহ মার্কস্‌বাদী দর্শনের দ্বান্দ্বিক জড়বাদে আর এক নতুন দিকে মুখ-ফেরানো। শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে বিদ্রোহের যে উন্মাদনা, যে প্রবল শক্তিময়তা, নজরুলের সূত্রে সুকান্তর মধ্যে তারই অন্তঃশীল স্বীকৃতি!

ভারতবর্ষ সুকান্তর স্বদেশ, ভারতবাসী সুকান্তর অতি আপনজন। এমন সম্পর্কও সুকান্তর কবিতায় প্রাচীন ঐতিহ্যভাবনায় সমন্বিত। 'মণিপুর' কবিতার প্রথমেই এর পরিচয়—

> এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
> সহস্র বছর ধরে একে আমি জানি পরিপাটি,

জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।

প্রাচীন ভারতের মাটি-মায়ের সংগে সম্পর্ককে বিস্মৃত হয়নি সুকান্ত। তার কবিতায় স্বদেশের ঐতিহ্যভাবনা স্বদেশপ্রেমের আবেগে নতুন এক ঐতিহ্য সৃষ্টির আর্তিতে অনুসন্ধিৎসু। তার ইতিহাস-অনুসন্ধান যেন এক ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিক কবির আত্ম-অনুসন্ধান! ঐতিহ্যের আয়নায় নিজেকে দেখা, বা মাঝে মাঝে দেখে নিজেকে ঠিক করে নেওয়া!

আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত। স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।

এসব সত্ত্বেও সুকান্তর বিশ্বাস ভারত-প্রাণে, ভারত-আত্মার অমেয় শক্তিতে। যুগে যুগে কালে কালে কত বীর, বিপ্লবী, মহাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে এখানে! তাঁদের স্বপ্নও এক নতুন দর্শনে সার্থক হয়েছে এখানেই!

তবুও অজেয়—এই শতাব্দী প্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখ,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।

এই ভারতবর্ষের এক মহান নেতা, কিশোর সুকান্তর কালে বীর সৈনিকের মতই—মহাত্মা গান্ধী! তাঁর বন্দনা গান সুকান্তর লেখনীতে হয়েছে ঐতিহ্যের আর এক দীপ্ত স্বীকরণ! 'মহাত্মাজীর প্রতি' শ্রদ্ধা নিবেদনে সুকান্ত-কণ্ঠ বড় আপন, বড় আন্তরিক, বড় মমত্বের লাবণ্যে সুন্দর, শোভন!

তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে
তোমাকে গড়ব প্রাচীন, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।

'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতায় কবির ছন্দরীতি ও শব্দ-প্রয়োগ এবং অন্ত্যমিলে অগ্রজ কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব তার ঐতিহ্যপুষ্টির পরিচায়ক নিঃসন্দেহে—

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।

এখানে 'হিজিবিজি' ও 'গান্ধীজী' শব্দ দুটির অন্ত্যমিলে সত্যেন্দ্রীয় যে শব্দ-ভাবনা, তা নিশ্চয়ই অগ্রজ কবির অনুস্মৃতি ও প্রভাব প্রমাণ করে।

সুকান্ত ঐতিহ্য-অনুসরণে এক স্বীকৃত ও সার্থক কবি বাংলা কাব্যধারায়, সেই সংগে সেকালে নতুন কাব্য-বক্তব্যদানের প্রবক্তাও! কাব্যের পরিণতি কোথায়, কাব্যে মানুষের জীবনের কি মূল্যায়ন—সেই ভাবনাতেই যেন সুকান্ত রচনা করে তার 'হে মহাজীবন' কবিতাটি। এর প্রতীক, এর বক্তব্য নিঃসন্দেহে সুকান্তর কবিসত্তার উপযুক্ত।

'হে মহাজীবন' কবিতার বক্তব্য, চিত্রকল্প নিশ্চয়ই এক কমিউনিস্ট কবি সুকান্তর, বাংলা কাব্যধারায় নূতন বাণীর বক্তা সুকান্তর জীবনদর্শন। তা বিদ্রোহী আত্মার কবি সুকান্তর রক্ত-মাংস-মজ্জা—সব কিছুই।

সুকান্তর অগ্রজ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ইংলণ্ডে টি. এস. এলিয়ট যখন কাব্যে আমাদের শুনিয়েছেন—'উই আর দি হলো মেন', যখন এই উগ্র আধুনিকতার প্রবল ধ্বনি এলিয়টের লেখনীতে চিত্ররূপ পায়, তখন উনিশ শ একুশ সালের বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শোনান বাংলা কাব্যে চড়া রোদের মত বাস্তবতার সুর।

এই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ভাঙা গড়া' কবিতায় আধুনিক বাস্তবতার এক রূপ :

বহুদিন গত চৈতি গাজন
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,

হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয় শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

পৌরাণিক ত্রিশূলকে চাষীর লাঙ্গলের ফাল তৈরীর নির্দেশে আছে সেই আধুনিকোত্তম বাস্তবতা।

অন্যত্র 'হেমন্ত সন্ধ্যার বন্ধু' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ লিখলেন:

মাঠে মাঠে পাকা ধান অঘ্রাণা আঘ্রাণ
কার আশা পথ পানে তুলছে?
দ্বিতীয়ার চাঁদখানি, কাস্তের আধখানি
কোন্ কৃষাণীর মুঠে দুলছে?
হেমন্ত সন্ধ্যার বন্ধু।
বন্ধু গো মরমিয়া বন্ধু!

'দ্বিতীয়ার চাঁদ'কে কৃষকের কাস্তের আধখানা করে চিত্রকল্প রচনায় যে প্রতপ্ত বাস্তবতা, তারই ব্যঞ্জনাগর্ভ আরও ব্যাপক, সমস্ত একালের মানুষের জীবন-আচরণকারী পরিচয় সুকান্তর 'হে মহাজীবন' কবিতায়!

'হে মহাজীবন' কবিতা সুকান্তর নানাভাবে পুরনো ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন ভাবের, পথের দিক-নির্দেশক কবিতা।

কবি সুকান্তর জীবনদর্শনে দীপ্ত, প্রাজ্ঞ ভাবনায় গাঢ় কবিতা— 'হে মহাজীবন'।

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!

এমন কথা সুকান্ত বলে তার শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে চরম অসুস্থতা নিয়ে যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালের উদ্দেশে শেষ যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে।

এই কবিতার সৃজন-বেদনার কথা মনে রেখে এক সুকান্ত-সমালোচক কবিতার ব্যাখ্যায় বলেন:

'এই 'মহাজীবন'কে সম্বোধন করে কবি বলেছে, 'আর এ কাব্য নয়।' কেন? না, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' কী বেদনায়, কী যন্ত্রণায় সুকান্ত তার কবিতার কাছে বিদায় চেয়েছিল তারই জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে সুকান্তর রক্ত স্বাক্ষরিত ওই বাক্যটি: 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

'অথচ এটি তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল না।' (বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও সুকান্ত ভট্টাচার্য / জগদীশ ভট্টাচার্য)

এমন ব্যাখ্যা সুকান্তকে সম্যক বোঝার প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে। সমালোচক সুকান্তর একটি চিঠির অংশ তুলে মন্তব্য করেছেন, 'কবি হিসাবে সুকান্ত এই 'তৃতীয়ার তন্বী চাঁদের আলো'-তেই চোখ মেলেছিল, কিন্তু তার পরিবেশ তার চোখ থেকে এই সহজ-সুন্দর দৃষ্টি করে নিয়েছিল।······রূপকল্প হিসাবে পংক্তি অসামান্য হলেও সুকান্তর কর্মিসত্তার কাছে এখানে কবিসত্তার পরাজয় ঘটেছে।' (ঐ)

এই বক্তব্য 'হে মহাজীবন' কবিতায় সুকান্তর নতুন দৃষ্টি ব্যাখ্যার, নতুন পথের ইঙ্গিতকে ধরার আদৌ সহায়ক না হয়ে বরং সম্পূর্ণ কবি সুকান্তর স্বভাব-বিরোধী বক্তব্যকেই এনে দেয়।

সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবনের অসঙ্গতি, দুঃখ-যন্ত্রণা, অসহায়তা থেকে এই কবিতার জন্ম নয়। এই কবিতার জন্ম-সময় উনিশ শ ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ সাল—অর্থাৎ কর্মী ও কবি সুকান্তর 'কিশোর পুরুষে'র চরম জীবন ও কাব্য-অভিজ্ঞতার শেষতম পর্যায়ে। চারপাশে মৃত্যু, অভাব, দুঃখ, শাসন-শোষণ, অমানবিক সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করে সুকান্ত। সেই প্রত্যক্ষের বিষ পান করে করে কমিউনিস্ট কর্মী ও কবি সুকান্ত হয় কালের নীলকণ্ঠ! রচনা করে মহাকালের সঙ্গী হওয়ার উপযোগী মহাজীবনের রূঢ় বাস্তবতার কবিতা 'হে মহাজীবন'।

তাই সেই অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পে ও কঠিন বাস্তবতার ব্যঞ্জনায় চরণগুলি হয়ে যায় এক কমিউনিস্ট কবিরই কাব্য দর্শন—

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

এ কবিতায় 'মহাজীবন' যেন পূর্বসূরী কবিদের ধারণা-ধৃত সেই 'মহাজীবন' নয়, এ মহাজীবন যেনবা মহাকাল বন্দিত জীবন ! মহাকাল কারোর বন্দনা করে না। সে নিরাসক্ত, নির্মম। কিন্তু দৈবক্রমে যার বন্দনা করে বসে সে, তখন সে জীবন মহাকালের দোসর হয়ে যায়। 'জীবন' বড়, সীমাতিশায়ী না হলে মহাকালের বন্দনা পায়না, দোসর হয় না।

সুকান্তর 'মহাজীবন' এক আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী কবিপ্রাণের কল্পনায় ধরা বড় জীবন। সেই জীবনে ছন্দের লালিত্যের, দুঃখের-সুখের বিলাসের কবিতার স্থান নেই। মহাজীবন তাকে পরিত্যাগ করে। সভ্যতার অগ্রগতিতে কবিতার রূপ কি হবে—সুকান্ত তার প্রবক্তা। 'হে মহাজীবন' কবিতার অসামান্য চিত্রকল্পে তার চিরন্তন রূপাভাস। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট কবি সুকান্তর জীবনদর্শনও।

বাংলা কবিতার বাস্তবতা নতুন মোড় নেয় এই কবিতাতেই—যে কবিতা সুকান্তর কর্ম, ঘর্ম, মর্মজীবনের নির্যাস দিয়ে রচনা! এই রচনা সম্পর্কে কি করে বলা যায়—'এটি তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল না?'

ব্যক্তি সুকান্তর অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর আগের মুহূর্তের জীবনবোধ তার ব্যক্তিগত সূত্রে তিক্ত, দুঃখজনক, চরম হতাশার হতে পারে, কিন্তু কবি সুকান্তর ভাবনায় তা ব্যক্তিগত দুঃখের প্রকাশে স্থির থাকেনি, আগামী কালের কবি-ভাবনার এক নতুন প্রকরণের বাস্তব সত্যে নতুন সত্যবন্ধে সমন্বিত হয়ে গেছে।

'হে মহাজীবন' কবিতার মধ্যেই কবি সুকান্তর নতুন জীবনবেদ, বাংলা কাব্যধারার নবপর্যায় শুরু। নতুন ধারার চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় প্রতিমা!

কাব্য-ঐতিহ্য সুকান্ত স্বীকার করেছে, আবার তাকে পাশে রেখে নতুন কাব্য-ঐতিহ্য গড়ে তোলার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে—যার ক্ষীণ যোগ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-ভাবনায় মেলে।

কিন্তু সুকান্ত এ ব্যাপারে একমেবাদ্বিতীয়ম্। তার সূত্র তার নিজস্ব। যতীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকের দুঃখবাদী কবি, দুঃখাত্মবাদী দর্শনের স্রষ্টা, সুকান্ত চারের দশকের এক অবক্ষয়িত যুগ-পর্যায়ের কমিউনিস্ট কবি। সাচ্চা এবং চিরকালের কমিউনিস্টরা অবক্ষয়ের বিপক্ষে ভয়ংকর জীবনাবেগকে গ্রহণ করেই কমিউনিস্ট হয়। সুকান্তর যুগ তাই সুকান্তকে জীবনের মহত্তম শিক্ষায় দীপিত করেছে, অবক্ষয়ের বিষাদে বিবর্ণ করেনি। পাবলো নেরুদা, মায়কভ্স্কি, সুকান্ত! সেকালে বসে সেই বয়সে সুকান্তর এমন প্রাজ্ঞ মন ও মনন, এমন কাব্যিক অনুভব, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন বিস্ময়করতায় স্থির!

বাংলা কাব্যধারায় সুকান্তর অকাল মৃত্যু যেন সাধারণ মৃত্যু নয়, মহান মৃত্যুবরণ পরোক্ষে! কর্মী সুকান্ত নতুন সাম্যবাদী চেতনায় ছিল এক উজ্জ্বল কালজয়ী ব্রাত্য, কবি সুকান্ত বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যে নতুন যুগের সূচনা ঘটাতেই যেনবা এক আত্মিক সংকটের মধ্যে চলে আসে সময়ের রক্তক্ষরণে। হয়তবা ঐতিহ্য-লালিত বাংলা সাহিত্য-ধারার যে নতুন এক ধাপ-নির্মাণ প্রয়োজন সেকালে ছিল জরুরী, তাকেই জীবন দিয়ে গড়ার নিয়তি-নির্দেশ ছিল সুকান্তর মধ্যেই। প্রখ্যাত কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সুকান্তর 'জীবনযুদ্ধে সৈনিকোচিত রুক্ষশ্রী এসে মিশেছিলো।' সেই জীবনের রুক্ষশ্রী সমসময়ের করুণ শ্রীহীনতার পরিবেশে সুকান্তর কবিতায় এনেছিল আর এক কঠিন, রুক্ষশ্রী, ভিন্নস্বাদী বাস্তবতা। কবির ব্যক্তিজীবন, অকাল মৃত্যু, কবিতার বাস্তবতা—সব মিলে-মিশে বাংলা কবিতায় আনে এক নতুন যুগ। এ ক্ষেত্রে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বিচারণাই ঠিক: 'কাব্য-সাহিত্যে নতুন যুগকে প্রাণ দিতে আজ কবির যে অভিজ্ঞতা ও সাধনা দরকার তার পুরস্কার মৃত্যু। সুকান্ত সেই ভয়ানক সত্য ও কাব্য-সাহিত্যের চরম সাফল্যকে, আমাদের সমস্যাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।'

সুকান্ত ঐতিহ্যানুসারী থেকেও নতুন সময়ের নব ঐতিহ্য সূচনার এক শঙ্খবাদক পৌরাণিক ভগীরথ।

চতুর্দশ অধ্যায়

একালের কবিকুল ও কবি সুকান্ত

সুকান্তর মৃত্যুর পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত।

সেই যুদ্ধ নেই, নেই প্রত্যক্ষ মন্বন্তর-হাহাকার! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সুকান্ত দেখে গেছে ঘৃণ্য হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। তার পরের স্বাধীনতা লাভ সুকান্তর দেখা সম্ভব হয়নি। নিষ্ঠুর নিয়তির দৃষ্টিতে সে স্তব্ধ হয়ে যায় তার আগেই।

কিন্তু এসবের পরেও—স্বাধীনতালাভের পরেও সেই মুনাফাখোর, মজুতদারদের সংখ্যা হয়েছে সংখ্যাতীত। ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন রূপ নিয়েছে সমস্তরকম ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও শাসন-শোষণ-পীড়নের অবসানে সুস্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জন-গণ-মনের সোচ্চার দৃঢ় সন্নদ্ধ শপথে!

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর থেকেই সমাজের অভ্যন্তরে এক ক্ষয়রোগের জীবাণু আশ্রয় নেয়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সেই রোগের স্বরূপ হয়ে ওঠে দুরূহ কর্কটব্যাধির মত!

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এমন সব দুরূহ ব্যাধি বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় ঘৃণ্য ব্যাধির মত গোপনে লালিত হয়ে চলে!

দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে মানুষ শেখেনি স্বাধীনতা লাভের পরেও!

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশে যে গণজাগরণ, বিদ্রোহ-বিপ্লবের রক্তিম রূপ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অমানবিক সমাজ-ব্যাধিকে নির্মূল করতে জাগ্রত গণচেতনা, তা আজ অনেক বেশী ঊর্ধ্বে উত্তোলিত বজ্রমুষ্টির বিদ্রোহে সরব।

কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা আর নয়, চাই শোষিত মানুষের,

সর্বহারা মানুষের স্থায্য প্রাপ্তির সমাজরূপ—সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা !
—সাম্যবাদী জীবনবেদ রচনাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

একটি জাতির অনন্তকাল বেঁচে থাকার উপযোগী দুই স্নায়ুতন্ত্র—শ্রমিক সম্প্রদায় ও কৃষককুল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে তাদের সমাজ গড়ার আন্দোলন সমানে চলেছে—চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন, অগ্নিগর্ভ কালের মতই।

আর এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন অগ্নিগর্ভ কাল—যাকে বলা যায় সে সময়ের কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের মতে 'এক ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির উপর বসে থাকার মত কাল'—সেই সময়েই সুকান্ত কলম ধরে ! সেই কলমেই লেখা হয়ে যায়—

কখনো হঠাৎ মনে হয় :
আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো
চোখে আমার বহুদিনের তন্দ্রা।
*　　　*　　　*
আমার দিনপঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম. পবিত্র তিথি ॥

সুকান্তর এক একটি কবিতা সুকান্তর লেখনীতে এক একটি অসম্ভব বিস্ফোরণ ! তার কাল তার সহায়ক !

কিন্তু সুকান্তর কালে যে অস্থিত অবস্থা, তাতে সুস্থ কবিতা লেখা কি সম্ভব ? সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস তা বলে না ! বারো শ দুই খৃষ্টাব্দের তুর্কী আক্রমণের পর ভয়ংকর অস্থিত অবস্থার পরিবেশে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুর্বর হয়েছিল টানা তিনশ' বছর ! আঠারো শতকে, অন্তত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের অমারাত্রির মত পরিবেশে সাহিত্য সংস্কৃতি যেনবা সেই কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাৎস্থল অন্ধকার গুহায় মুখ লুকিয়েছিল !

তবু অস্থিত অবস্থায় সুকান্ত হয় ব্যতিক্রম ! একদিকে ভয়াবহ যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মৃত্যু, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আর

একদিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, আকণ্ঠ স্বাধীনতা-স্পৃহা, বিপ্লব বিদ্রোহ, একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সুকান্তর জীবনের সাতটি বছর উত্তাল, ভয়ংকর অস্থিত।

এই অবস্থায় সুকান্ত লেখনী ধরে, যেনবা সব্যসাচীর স্বভাবে একাধিক কবিতা রচনা করে যায় দু'হাতে। এমন প্রাণশক্তি নিঃসীম নীলিমা থেকে ছিটকে আসা উল্কার মত!

সুকান্ত বাংলা কাব্যধারায় এক প্রবল ব্যতিক্রম। তার যদি উত্তরসূরী না থাকে, আপত্তি করার থাকে না: বাস্তবিকই সুকান্ত হঠাৎ দেখা এক উল্কার মত। সমস্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবেশকে উপেক্ষা করে নিজের প্রকাশ স্বাক্ষরিত করে রাখে কমিউনিস্ট কবিতায়। সুকান্তই প্রথম বাংলা কাব্যের মায়কভ্স্কি, প্রথম সাচ্চা কমিউনিস্ট কবি।

সুকান্তর কবিতা বিদ্রোহের, বিপ্লবের, গণজাগরণের। তার কবিতার দুই লক্ষ্য—বিদেশী বণিকদের শাসনের দাপটকে দেশের বুক থেকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, আর স্বাধীন ভারতের বুকে নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পত্তন করা। চিরকালের মানবভাবনা তার নির্নিমেষ লক্ষ্যের ধ্রুবতারা। কাল ও কালের ঘটনা তার কবিতার মূলধন। সুকান্ত বুঝিবা নিষ্ঠায় এক শ্মশানচারী তান্ত্রিক কবি।

সুকান্ত মার্ক্সবাদী কবি। তার ইতিহাসদর্শন এক খাঁটি বস্তুবাদীর দর্শন। সমাজের বিবর্তনের যা নিয়ম, তাতে একদিন শোষিত মানুষের হাতেই সমাজ গড়ার মূল দায়িত্ব-ভার বর্তাবে—এই ছিল বিশ্বাস।

'প্রোলেতারিয়েতদের বিকাশে ও জয়ে যা কিছু সহায়ক তা-ই শুভ, যা ক্ষতিকারক তা-ই অশুভ।'—লুনাচারস্কির এই উক্তির মর্মসত্যই ছিল সুকান্তর সমাজবাদী ভাবনার অঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বসে সুকান্তর কবিতা রচনা যেন মূল সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই এক শৈল্পিক শরীর দান প্রয়াস!

সুকান্ত সেই প্রয়াসে সত্যকাম, সিদ্ধকাম!

কারণ—'নিউ সোস্যালিস্ট এ্যাটিচিউড ইজ দি রেজাল্ট অফ দি

রাইটার্স্ অব্ আর্টিস্ট্স্ এ্যাডপ্টিং দি হিস্টোরিক্যাল ভিউ পয়েন্ট অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাশ…।'—আর্নস্ট ফিশারের এমন উক্তি সুকান্তর কবিতা রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে ব্যাখ্যা করে দেয়।

ক্রমবিকাশের অমোঘ নিয়মে সুকান্তর কবি-প্রতিভায় অস্থিত কালেও কবিতা জন্ম নিয়েছে, কবিতার শরীরে বাণীগ্রহণ করেছে শোষিত শ্রমিক শ্রেণী!

কিন্তু সুকান্তর কাল বদলে গেছে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও সুকান্তর কবিতা কিরকম? কবি সুকান্ত কিভাবে গৃহীত? পরিবর্তিত বদলের পালায় কি তার মূল্যায়ন?

সুকান্ত এমন এক জনপ্রিয় কবি, যার মূল্যায়ন উগ্র সমালোচনায় বোধ হয় মেলে না, মেলে সহৃদয় আলোচনায়! রামায়ণের রাম-সীতা সিদ্ধরসের প্রত্যয়ে এমনভাবে জনমন দখল করে নিয়েছে, এখন তার কোন সমালোচনাতেই তাদের পাওয়া যায় না, আলোচনায় বরং আজ তাদের গাথা গৌরবময় হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে!

ঠিক তেমনি সুকান্ত! যেমন জনপ্রিয় কবি নজরুল! যেমন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র! ঠিক তেমনি সর্বহারা মানুষের জনপ্রিয় কবি সুকান্ত!

বর্তমান কালের সংগে সুকান্তর কালের ব্যবধান অনেক বেশী। বরং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একাধিক গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত কবিদলের মধ্যে সুকান্ত নিঃসঙ্গ। কিন্তু জনগণের দলে সুকান্ত প্রবহমান নদীর জলের মত সদা গতিপ্রাণ, সদা পবিত্র, সদা জীবন্ত! কারণ সুকান্ত অবলীলায়, সহজ সরল কাব্যভাষায় আর নতুন যুগের, আগামী দিনের কাব্যভাবনায় যে পাঠককুলকে জয় করতে পেরেছে, তেমন কোন কবি, কোন কবিগোষ্ঠীই পারেনি।

পারেনি অর্থে পারা সম্ভব ছিল না। সুকান্ত রক্ত দিয়ে জীবন-প্রাণের কবিতাকে নিয়েছিল, পঠন-পাঠনের তত্ত্ব দিয়ে নয়। দেশের মানুষের সত্যে কবিতার সত্যমূল্য যাচাই করতে বসেছিল, বিদেশী

কবিদের ভাবনায় বুদ্ধিসর্বস্ব অনুকৃতিতে লেখনীকে 'কম্প্রমাইজে'র মধ্যে নিয়ে যায়নি।

এখানেই সুকান্তর স্বাতন্ত্র্য নিষ্ঠাবান তান্ত্রিকের স্বাতন্ত্র্যের মত! স্বাতন্ত্র্য জীবন উপস্থাপনার নিরাসক্তিতে। অনন্যতাও শালবৃক্ষের মত কবি-ব্যক্তিত্বে! এখনকার কবিদের অনেকেই সম্পূর্ণ, ব্যক্তিক; কেউ কেউ কিছু সামাজিক, সর্বরূপে কিন্তু সেই ব্যক্তিক। রাজনীতি, সমাজনীতির থেকে মন ও মননে অন্তর্মুখীন থেকে তারই অভিজ্ঞতায় লালিত চিত্রকল্প সাজিয়ে কবিতা বলতে একালের একাধিক কবিকুল অভ্যস্ত। দিন বদলের কালে এটাই বুঝি নিয়ম! এটাই বুঝি একদলের কবিকুলের ভাগ্যে সেই 'বেল্‌সাজার্স ফিস্ট' গল্পের আকস্মিক দেওয়াল লিখনের মত?

সমাজ-সচেতনা-বিবিক্ত, শামুকের মত আত্মগোপনে অভ্যস্ত একালের এক গোষ্ঠীর কবিকুলের কাব্য প্রয়াসের পাশে সুকান্ত নেই, আছে ঠিক বিপরীতে।

বলা ভাল, একালের কবিকুল প্রাক দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালীন কাব্য ভাবনাকেই আঁকড়ে রেখে যে গোষ্ঠীর ছায়ায় স্থির হন, তা নিঃসঙ্গতার, একা থাকার! তিরিশের দশকের কবিরা নিঃস্ব হয়েছিলেন দুঃখের বিলাসে। পাঁচ-ছয়-সাতের দশকের একদল কবি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে একা হওয়ার কারণেই শব্দ, চিত্রকল্প, প্রকরণে আত্মগোপন করেন নিজের মধ্যেই! সুকান্তর পাশে দাঁড়াতে অক্ষম এঁরা, দাঁড়ালেন বিপরীতে।

তা-ই স্বাভাবিক! সমস্ত জনগণকে সম্মিলিত করে চারপাশে নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম সুকান্ত। তার কবিতায় সমাজ, মনুষ, কর্ম, ঘর্ম কবির মর্মের দাবিতে মিলে-মিশে একাকার। এর যে সম্মিলিত শক্তি, একালের আত্মমুখ, অহংসর্বস্ব কবিকুল তা পাবেন কি করে?

অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে জন-জাগরণের জোয়ার আরও প্রবল, আরও সবল বিদ্রোহের, বিপ্লবের উদ্যত বজ্রমুষ্ঠি! সমাজবাদ, সাম্যবাদ

প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত অসীম সর্বজনধৃত অভীপ্সা বিস্ময়কর হয়ে আছে সারা বাংলাদেশের পথে-ঘাটে, কলে-কারখানায়, মিছিলে-মানুষে।

সুকান্ত ছিল এসবের কবি। এ হল জাগ্রত গণচেতনার ক্রম-অগ্রগতির রূপ ও স্বরূপ! সুকান্তর কালে যা ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মত উথাল-পাথাল, জটিল, নানা 'ক্রস্-কারেণ্টে' হতবুদ্ধিকর, স্বাধীনতা-উত্তর কালে তা হয়েছে সংহত, হয়েছে একমুখীন।

এখন সেই মজুতদারকে, মালিককে চিহ্নিত করা যায়, শত্রুকে ধরা যায়। এখন সেই লক্ষ্যকে পরিষ্কার করে সকলের সামনে রাখা যায়। এমন একমুখীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কালে কবি সুকান্তর সমান দাপট থাকতে বাধ্য। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ তা-ই!

সুকান্তর শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা এক নয়। সুকান্তর শিক্ষা তার কবি-ভাবনাকে যেখানে নিয়ে গেছে, মানুষ সুকান্তকে যে কর্মের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সে সবই একটি উদ্দেশ্যে দীপ্ত—সুকান্ত হবে নতুন যুগের সমাজ-সচেতন কবি, সুকান্ত নতুন জাতের বাস্তবতার কবি, সুকান্ত সবরকমের সর্বহারাদের জীবনের বিশ্ববিম্বন!

একালের সুকান্তর উত্তরসূরী না থাকতে পারে, একালে সুকান্তকে আর এক গোষ্ঠীতে রেখে দূরে সরানো যেতে পারে, কিন্তু জনগণ যেখানে শিল্পের বিচারক, কাল যেখানে শিল্পের যথার্থ ধারক ও বাহক, সেখানে সুকান্ত এক কঠিন বিশ্বাস।

দিনবদলের কালে কবি সুকান্ত সম্পর্কে এমন ভাষ্যই বোধ হয় সমস্ত প্রতিকুল ভাবনার যোগ্য উত্তর এবং এক অর্থে যথার্থ সুকান্ত-মূল্যায়নও: 'তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন সমাজ সচেতন নতুন যুগের কবি বলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এদেশে যতোই তীব্র হবে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাও ততো নতুন নতুন ব্যঞ্জনা ও প্রেরণায় ভাস্বর হয়ে উঠবে।' ('নতুন যুগের কবি সুকান্ত' / মণীন্দ্র রায়)

শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা—এমন সব দেশের সূত্রে সারা পৃথিবীর

দিকে তাকিয়ে সুকান্তর কবিতার কথা ভাবতে বসলে কোন্ উত্তর মেলে?

উত্তরঃ নিরন্তর দিন বদলেও কবি সুকান্তর দিন সদা-পূর্ণ এবং কবিতা স্বয়ং-সম্পূর্ণ!

সুকান্ত সর্বকালের মানবমনে সুস্বাগতম্!

পঞ্চদশ অধ্যায়

কবি সুকান্ত ও একালের পাঠক

কবি সুকান্তর সমকালের নয়, উত্তরকালের পাঠক কারা? সংখ্যায় তারা কত? কবিতার পাঠক এবং সুকান্তর কবিতার পাঠক—এই দুই অর্থেই তাদের গুণগত মান কি রকম?

সুকান্ত-উত্তর কালে বসে এরকম আত্মমুখী জিজ্ঞাসা যে কোন স্বভাবী, বোদ্ধা পাঠকের থাকতেই পারে!

উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নেমে আসেন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে —'যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, অসহায়, দুর্বল, নিপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব কোনদিনই রাখেনি'—তাদের মধ্যে!

কবি সুকান্তর সমস্ত রকম কর্মতৎপরতাও ছিল তা-ই—যারা শোষিত, সর্বহারা তাদের মধ্যেই তার কর্মমুখর জীবন কাটে, তাদের জন্যই তার শহীদ হয়ে-যাওয়া! আর কবিতা? সমস্ত কবিতারই উৎসর্গ পত্রে বুঝিবা এমন কথাই অলিখিত. কিন্তু সত্য—'চিরকালের শোষিত শ্রেণীর উদ্দেশে!'

সমালোচকদের তুমুল সমালোচনা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পাশে চুলচেরা বিচারে শরৎচন্দ্রকে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক! আজও তাঁর জনপ্রিয়তা ম্লান হওয়া তো দূরের কথা—উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মুখে!

বিদগ্ধ সমালোচকদের প্রসঙ্গ বাদ রেখে, তাঁদের পাঠক হিসেবে মান্য করা থেকে সরিয়ে রেখে, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মান বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গ পাশে রেখেই বলা যায়, কোন লেখকের ভাগ্যে জনপ্রিয়তা যাদুদণ্ডের স্পর্শের মত রহস্যময়। পাঠক-জনতার

মধ্যে চলে আসার ব্যাপারটি একজন লেখকের মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের বিস্ময়কর কাজ করার মত।

অথচ একজন লেখকের পক্ষে তার পাঠকরা সব সময়েই নিরাকার। আংশিক পাঠককুল যতই বুদ্ধিবাদী হোক, সমবেতভাবে একজন লেখকের পক্ষে তারা 'নির্জন জনতা'র মত।

মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের নায়ক যত দ্রুত দর্শক-জনতার মধ্যে এসে যেতে পারেন, একজন লেখক তা পারেন না। আবার একজন কথাসাহিত্যিক জনপ্রিয়তায় যত ত্বরিত পাঠককুলে আত্মবিস্তার আনতে সক্ষম, একজন কবির পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। এমনও হয়, একজন কবি প্রচুর ভাল লিখেও পাঠক-জনতার বিরাট অংশের মধ্যে আসতে সক্ষম হন না।

কবিতার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিশ্বকবিত্বের নিরীখ সব সময়েই ব্যতিক্রমে থাকে। কারণ কবিশ্রেষ্ঠের প্রতিভা সমস্ত হিসেবের বাইরে।

অন্যদিকে কবি সুকান্ত! রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনার প্রশ্নই বাতুলতা, কিন্তু মাত্র সাত বছরের কবিতা রচনায় যে জনপ্রিয়তা, তা চিরকালের বিস্ময়।

আমাদের প্রশ্ন: এমন জনপ্রিয়তা কেন? কবি সুকান্তর জনপ্রিয়তার স্বরূপ কি? কবিতার কোথায় সেই রূপকথার সোনার যাদুদণ্ড বা চাবিকাঠি—যা দিয়ে অগণন পাঠকের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় অবলীলায়?

সুকান্তর কাব্য-পাঠকরা জানে, সেই ক্ষমতা:

এক, সুকান্তর কবিতার সহজতায়, সারল্যে, প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতায়;

দুই, চিরকালের সর্বহারাদের, শোষিত মানুষের রক্তের আত্মীয়তার বন্ধনে মিশে যাওয়ায়,

তিন, সমস্ত রকম বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও বিপ্লবকে চিরকালের মানবিক মূল্যবোধ-দীপ্ত একটি মাত্র সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে—'পোষমানাকে অস্বীকার করো, / অস্বীকার করো বশ্যতাকে। / চলো, শুকনো হাড়ের

বদলে, / সন্ধান করি তাজা রক্তের / তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো খাদ্য। / শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক / সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে ॥'

এমন স্পষ্ট সুস্থ বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ যার কবিতায়, তার পাঠক তো ময়দানে বিশাল সমাবেশে জমা হওয়ার জন্য যাত্রী-মিছিলের অগণন মানুষের মতই তৈরী হয়ে যাবে! পাঠকের জন্ম তো স্বতঃস্ফূর্ততায়!

সুকান্তকে পাঠক তৈরীর জন্য আত্ম-প্রচার করতে হয়নি, পাঠকদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় বসতে হয়নি! সমস্ত কর্মে যেমন ছিল ব্যক্তি-স্বার্থ সম্পর্কহীন কর্মীর নিরাসক্তি, কবিতা রচনার গভীর গোপন কালেও ছিল তেমনি সর্বকালের মানুষের ও মানবপ্রাণের জন্যই ক্ষণকালের জীবন ও মানুষ সম্পর্কে নিরাসক্তি!

অথচ সুকান্তর ভাগ্যে ঘটে যায় অগণন পাঠকের বিপুল বিশ্বপ্লাবী অভিনন্দন। পাহাড়-ভাঙা ঝর্ণার মত যার আবেগ, সমুদ্রের অগণন তরঙ্গের মত যার নিত্য চলনধর্ম, নিত্য সৃজন!

প্রত্যেক কালেই দেখা যায়—পাঠক সমাজ দুই দলে বিভক্ত—একদল 'এ্যাভারেজ', আর এক দল 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল!' একদল কবির কাছে কালের দাবী, চাহিদাটুকুও আগাগোড়া বুঝে নিতে চায় নগদ বিদায়ের মূল্যে, আর একদল তাকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করে কালের কষ্টিপাথরে তাকে স্থায়ী বা অস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করতে উন্মুখ।

দ্বিতীয় দল চিরকালই সংখ্যায় অনেক কম থেকে যায়।

প্রথম দলের পাঠকও কবিকে চিরকাল ধরে থাকতে সক্ষম হয় না। যুগের ও কালের প্রবাহে তারা গা ভাসায়। রুচি বদলানোর সংগে সংগে ভেসে ওঠে, আবার নতুন পাড়ে ভিড়ে যায়।

কবি সুকান্ত দুই দলকেই সমান ভাবে কাছে আনতে পেরেছে—এখানেই তার পাঠক-সৃষ্টির অনন্যতা। এবং এই অনন্য-ক্ষমতার মূলমন্ত্র আছে তার কবিতার মধ্যে, তার কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই!

সুকান্তর কালে সাধারণ ও অ-সাধারণ দুই শ্রেণীর পাঠকরাই ছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে অভ্যস্ত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু উনিশ শ' উনচল্লিশে, রবীন্দ্রনাথের উনিশ শ' একচল্লিশে।

তার পরের সময়ে সুকান্তর কবিতা নতুন স্বাদ এনে পাঠকদের নতুন ভাবে তৈরী করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের মন্ত্রে নজরুলের কবিতা দীক্ষা দিয়েছে—জনমানসে, কাব্য-পাঠকদের। কল্লোলের কবিরা দুঃখের বিলাসে আর পাশ্চাত্য দীক্ষায় পুরুষ-রমনীর জৈব সম্পর্ক-সূত্রে তখন নিঃসঙ্গ থাকতেই অভ্যস্ত। জৈব সম্পর্ক তো চতুষ্কোণে আবদ্ধ। ঠিক সেই সময়ে, সেই প্রেক্ষিতে এটাই বুঝি ছিল তাদের সহ-জ ললাটলিখন!

যে কোন সূত্রেই বিলাস কার না প্রিয়?

সাহিত্যে বিলাস তো 'এ্যাভারেজ', দুরূহ-জীবনভাবনা বিমুখ পাঠকদের কাছে মুখরোচক খাদ্যের মত! ঘন শীতের দিনে চড়া-রোদে পিঠ রেখে আরামে বসে থাকার মত।

তার ওপর সুকান্ত যখন কবিতা লেখে তখন তো অন্ন-বস্ত্রের অভাবে, হাহাকারে, যুদ্ধের বিভীষিকায় মানুষের শিল্পের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কথা! বিশেষ করে বাস্তবজীবনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিমসিম, সদ্য তৈরী-হওয়া গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে তো নিশ্চয়ই।

সেই সময়ে সুকান্ত কবিতা লিখে নতুন কবিতার ক্লাশ নেওয়ার মত, ক্লাশে ছাত্র তৈরীর মত নতুন কবিতার পাঠক তৈরী করে যায়! কবিতার পাঠক তৈরী করা! ভয়ংকর দুরূহ কাজ! সুকান্ত আত্ম-জীবনের রক্তদানের নির্মমতায় কবিতা লিখে সেই কাজ স্পষ্ট করে গেছে! নজরুলে যার সূত্রপাত, সুকান্তে তার সাধনা ও সিদ্ধি, উত্তরসূরীদের কাছে তারই বিস্তার! তার কবিতায় কোথায় সেই গোপন সম্মোহনী মন্ত্র? সেই সঞ্জীবনী সুধা?

এসবের উত্তর আছে কবিতার মধ্যে যেমন, তেমনি তার কবিতার পাঠক শুধুমাত্র পড়ুয়াদের মধ্যে সীমিত না থেকে আবৃত্তিকার, গায়ক,

সুরকার, নৃত্যশিল্পী, রাজনীতিবিদ, মিছিলের নেতৃত্বদানকারী কমরেড—এদের মধ্যেও !

একালে সুকান্ত দেওয়ালের পোস্টার লিখন থেকে শুরু করে গানে, নৃত্যে, সুরে, আবৃত্তিতে অভূতপূর্ব অভিনন্দিত। এই বিপুল অভিনন্দনেই প্রমাণ—সুকান্তর কবিতা ও সুকান্তর পাঠক-জনতা—একই আত্মার দুই অভিব্যক্তি ! একটি বিশাল পুরুষের শরীরে কালের আলোর প্রতিফলনে সৃষ্টি-হওয়া দুই প্রতিবিম্ব !

দেশ থেকে আজও ধনতন্ত্রের মালিক, মজুতদার শ্রেণী মুছে যায় নি, অবলুপ্ত হয়নি অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর মিথ্যা অহংকার, দম্ভ, দাপট, বন্ধ হয়নি বিদ্রোহ, বিপ্লবের উতরোল। কালের বিবর্তনে সমাজের চেহারাও ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে তথা সাম্যবাদী মন্ত্রের দীক্ষায় দীপিত হয়নি সম্পূর্ণত ! তাই সুকান্তর কবিতার পাঠকও কমেনি।

মনে হয়, সমস্ত অবজ্ঞা, অবহেলা, অভাব, বেদনার অসহনীয় অবস্থাকে শেষতম প্রাণবিন্দুর ঔজ্জ্বল্যে সহ্য করে সেই শেষ শ্বাস ফেলার আগের কিশোর পুরুষ কবি-সুকান্ত স্যানিটোরিয়ামের বিছানায় তাজা, সর্বশেষ রক্ত বমনে যে শাশ্বত প্রতিশ্রুতি রেখে গিয়েছিল, আজও তার প্রতিশ্রুতি শোনায় তার কবিতা রাবণের চিতার মত অমরতায় :

> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
> অবশেষে সব কাজ সেরে,
> আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
> করে যাব আশীর্বাদ,
> তারপর হব ইতিহাস।

এমন ইতিহাস হতে সময় লাগে। সুকান্তর কবিতায় সেই অমোঘ ইতিহাসের অনন্ত প্রতিশ্রুতি ! সেদিন সমস্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-মুক্তির দিন !

সমস্ত স্তরের সুকান্ত-পাঠকদের পক্ষ থেকে আমাদের সেই দিনের জন্য আছে চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা !

পরিশিষ্ট

ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট

কেবলমাত্র বিশেষ গ্রন্থনামগুলিকেই উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। ভারতীয় এবং বিদেশী প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে বর্ণানুক্রমিক সাজানো হল। কোন কোন বিশেষ প্রবন্ধ-নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে আলাদাভাবে 'প্রবন্ধ' উল্লেখ করতে হয়েছে।